سورة الصف

সূরা সাফ্ফ

মদীনায় অবতীর্ণ, ১৪ আয়াত, ২ রুকূ'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○ يٰٓاَيُّهَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ○ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ
تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ○ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ
سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ○ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ
يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِيْ وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ۭ فَلَمَّا زَاغُوْٓا
اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ۭ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ○ وَاِذْ
قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِي
اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ۭ فَلَمَّا جَاۗءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○ وَمَنْ
اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَي اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعٰٓى اِلَى الْاِسْلَامِ ۭ وَاللّٰهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○ يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ
وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ○ هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ
بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَي الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ○

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে।

তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাবান। (২) হে মু'মিনগণ! তোমরা যা কর না, তা কেন বল? (৩) তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহ্‌র কাছে খুবই অসন্তোষজনক। (৪) আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা সীসা গালানো প্রাচীর। (৫) স্মরণ কর, যখন মূসা (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দাও, অথচ তোমরা জান যে, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূল। অতঃপর তারা যখন বক্রতা অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে বক্র করে দিলেন। আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না। (৬) স্মরণ কর, যখন মরিয়ম-তনয় ঈসা (আ) বলল ঃ হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূল, আমার পূর্ববর্তী তওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি এমন একজন রসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তাঁর নাম আহমদ। অতঃপর যখন সে স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করল, তখন তারা বলল ঃ এ তো এক প্রকাশ্য যাদু। (৭) যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে আহূত হয়েও আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলে, তার চাইতে অধিক জালিম আর কে? আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না। (৮) তারা মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহ্‌র আলো নিভিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ্ তাঁর আলোকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে। (৯) তিনিই তাঁর রসূলকে পথ-নির্দেশ ও সত্যধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে একে সব ধর্মের উপর প্রবল করে দেন যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করে (মুখে অথবা অবস্থার মাধ্যমে), তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়। (অতএব, তাঁর প্রত্যেক আদেশ মেনে নেওয়া জরুরী। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে জিহাদের আদেশ, যা এই সূরায় বর্ণিত হয়েছে। এই সূরা অবতরণের কারণ এই যে, একবার কয়েকজন মুসলমান পরস্পরে আলোচনা করল যে, আমরা যদি এমন কোন আমল জানতে পারি, যা আল্লাহ্‌র কাছে খুবই প্রিয়, তবে আমরা তা বাস্তবায়িত করব। ইতিপূর্বে ওহুদ যুদ্ধে কোন কোন মুসলমান পলায়ন করেছিল। এ ছাড়া জিহাদের আদেশ নাযিল হওয়ার সময় কেউ কেউ একে দুরূহ মনে করেছিল। সূরা নিসায় এর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই ইরশাদ নাযিল হল ঃ) মু'মিন-গণ! তোমরা এমন কথা কেন বল, যা কর না? তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহ্‌র কাছে খুবই অসন্তোষজনক। আল্লাহ্ তা'আলা তো তাদেরকে (বিশেষভাবে) পছন্দ করেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে যেন তারা সীসা গালানো প্রাচীর (অর্থাৎ সীসা গালানো প্রাচীর যেমন মজবুত, অপরাজেয় হয়ে থাকে, তেমনি তারা শত্রুর মুকাবিলায় পশ্চাদপদ হয় না। উদ্দেশ্য এই যে, বল, আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমলটি যদি আমরা জানতাম! শুনে নাও, সেই আমল হচ্ছে জিহাদ। জিহাদ নাযিল হওয়ার সময় তোমরা কেন একে দুরূহ মনে করেছিলে এবং ওহুদ যুদ্ধে কেন পলায়ন করেছিলে? এসব বিষয় সত্ত্বেও বড় বড় দাবী করা আল্লাহ্‌র কাছে খুবই অশোভনীয় ও অপছন্দনীয়। অতএব,

আয়াতে বৃথা আস্ফালন ও মিথ্যা দাবীর কারণে শাসানো হয়েছে। আমলবিহীন উপদেশ আয়াতের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতঃপর কাফিররা যে হত্যা ও লড়াইয়ের যোগ্য পাত্র, এর কারণ অর্থাৎ রসূলকে কষ্টদান, মিথ্যারোপ ও বিরোধিতা বর্ণনা করা হচ্ছে। এর সাথে মিল রেখে হযরত মূসা ও ঈসা (আ)-র কাহিনী বর্ণনা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছেঃ স্মরণ কর) যখন মূসা (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে বললঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দাও, অথচ তোমরা জান যে, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূল। (তাঁর সম্প্রদায় বিভিন্নভাবে তাঁকে কষ্ট দিত। তন্মধ্যে কয়েকটি ঘটনা সূরা বাকারায় বর্ণিত হয়েছে। অবাধ্যতা ও বিরোধিতাই সব ঘটনার সারমর্ম)। অতঃপর (একথা বলার পরও) যখন তারা বক্রতাই অবলম্বন করল (এবং সুপথে এল না) তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরকে (আরও বেশী) বক্র করে দিলেন। (অর্থাৎ নাফরমানী ও বিরোধিতা আরও বেড়ে গেল। সদাসর্বদা পাপ করলে আল্লাহ্‌র প্রতি অন্তরের ঝোঁক ও তাঁর আনুগত্যের প্রেরণা হ্রাস পাওয়াই নিয়ম)। আল্লাহ্ তা'আলা এমন পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না। (এটাই তাঁর রীতি। তারাও আল্লাহ্‌র রসূলকে বিভিন্ন প্রকার বিরোধিতা করে কষ্ট প্রদান করে। তাই তাদের বক্রতা ও পাপাচার আরও বেড়ে যায়। এখন সংশোধনের আর আশা নেই। অতএব, তাদের অনিষ্ট দূর করার জন্য জিহাদের আদেশ উপযুক্ত হয়েছে। এমনিভাবে সে সময়টিও স্মরণীয়) যখন মরিয়ম-তনয় ঈসা (আ) বললঃ হে বনী-ইসরাঈল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূল। আমার পূর্ববর্তী তওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি এমন একজন রসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তাঁর নাম আহমদ। এই সুসংবাদ যে ঈসা (আ) থেকে বর্ণিত আছে, তা স্বয়ং খৃস্টানদের বর্ণনা দ্বারা হাদীসসমূহে প্রমাণিত আছে। সেমতে খাযেনে আবূ দাউদের রেওয়ায়েতক্রমে আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর উক্তি বর্ণিত আছে যে, বাস্তবিকই হযরত ঈসা (আ) এই পয়গম্বরেরই সুসংবাদ দিয়েছিলেন। নাজ্জাশী খৃস্টধর্ম সম্পর্কে সুপণ্ডিতও ছিলেন। খাযেনেই তিরমিযী থেকে আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রা)-এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, তওরাতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র গুণাবলী উল্লিখিত আছে এবং একথাও আছে যে, ঈসা (আ) তাঁর সাথে সমাধিস্থ হবেন। ঈসা (আ) তওরাতের প্রচারক ছিলেন, তাই এটা যেন ঈসা (আ) থেকেই বর্ণিত আছে। মাওলানা রহমতুল্লাহ্ সাহেব 'এযহারুল হক্কে' তওরাতের বর্তমান কপি থেকে একাধিক সুসংবাদ উদ্ধৃত করেছেন। (দ্বিতীয় খণ্ড, ১৬৪ পৃ. কনস্টান্টিনোপলে মুদ্রিত) বর্তমান ইঞ্জীলে এসব বিষয়বস্তু না থাকা মোটেই ক্ষতিকর নয়; কারণ সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতদের মতে বর্তমান ইঞ্জীল অবিকৃত নয়। এতদসত্ত্বেও যা আছে, তাতেও এ ধরনের বিষয়বস্তু বিদ্যমান রয়েছে। সেমতে ইউহান্নার ইঞ্জীলের (যার আরবী অনুবাদ ১৮৩১ ও ১৮৩৩ খৃস্টাব্দে লণ্ডনে মুদ্রিত হয়,) চতুর্দশ অধ্যায়ে আছেঃ আমার চলে যাওয়াই তোমাদের জন্য উত্তম। কেননা, আমি না গেলে 'ফারকিলিত' তোমাদের কাছে আসবেন না। আমি গেলেই তাকে তোমাদের কাছে পঠিয়ে দেব। 'ফারকিলিত' শব্দটি 'আহমদেরই' অনুবাদ। কিতাবীরা অনুবাদ করতে গিয়ে নামেরও অনুবাদ করত। ঈসা (আ) হিব্রু ভাষায় আহমদ বলেছিলেন। এরপর যখন গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করা হল, তখন 'বিরকলুতূস' লিখে দেওয়া হল। এর অর্থ আহমদ অর্থাৎ বহুল প্রশংসিত, খুব

প্রশংসাকারী। এরপর গ্রীক ভাষা থেকে হিব্রুতে অনুবাদ করতে গিয়ে একেই 'ফারকিলিত' করে দেওয়া হল। হিব্রু ভাষার কোন কোন কপিতে এখন পর্যন্ত 'আহমদ' নাম বিদ্যমান রয়েছে। এই 'ফারকিলিত' সম্পর্কে ইউহান্নার ইঞ্জীলে বলা হয়েছে ঃ তিনি তোমাদেরকে সবকিছু শিখিয়ে দেবেন। এই জাহানের নেতা আসবেন। তিনি এসে দুনিয়াকে পাপের কারণে এবং সততা ও ন্যায়বিচারের খেলাফ করার কারণে শাস্তি দেবেন। এসব বাক্য থেকে বোঝা যায় যে, তিনি স্বতন্ত্র পয়গম্বর হবেন।---(তফসীরে-হাক্কানী) মোটকথা, ঈসা (আ) তাদেরকে উপরোক্ত কথা বললেন। অতঃপর যখন (এসব বিষয়বস্তু বলে নিজের নবুয়ত সপ্রমাণ করার জন্য) সে অর্থাৎ ঈসা (আ)) তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করল, তখন তারা (এসব প্রমাণ ও মো'জেযা সম্পর্কে) বলল ঃ এ তো এক প্রকাশ্য যাদু। [তারা যাদু বলে নবুয়ত অস্বীকার করল। এমনিভাবে ঈসা (আ)-এর পর আবার বর্তমান কাফিররা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত অস্বীকার করল। এটা মহা অন্যায় ও জুলুম। এই জুলুমের সংক্রমণ রোধ করার জন্য জিহাদের আদেশ সমীচীন হয়েছে। বাস্তবিকই] যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে আহূত হয়েও আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলে, তার চাইতে অধিক জালিম আর কে? আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। (আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলা এই যে, তারা নবুয়ত অবিশ্বাস করেছে। যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নয়, তা আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কযুক্ত করা এবং যা বাস্তবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে, তা অস্বীকার করা---উভয়ই আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলার শামিল। وَهُوَ يُدْعٰى বলায় কাজটি আরও বেশী মন্দ হওয়া বোঝা যায়। অর্থাৎ সতর্ক করার পরও সে নিজে সতর্ক হয়নি। وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى বলায় বোঝা যায় যে, তাদের অবস্থা সংশোধনের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তাই যুদ্ধের শাস্তিই উপযুক্ত হয়েছে। সে মতে যে ব্যক্তি এখনও ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞাত নয়, তাকে প্রথমে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া উচিত। এতে তার অস্বীকৃতি বাহ্যত নৈরাশ্যের আলামত। এখন তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা সিদ্ধ। অতঃপর জিহাদে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে সাহায্য, সত্যের প্রাধান্য ও মিথ্যার পরাজয় সম্পর্কিত ওয়াদা বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) তারা মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহ্র আলো (অর্থাৎ ইসলামকে) নিভিয়ে দিতে চায় (অর্থাৎ কর্মগত কৌশলের সাথে সাথে মুখ থেকেও আপত্তিজনক কথাবার্তা এই উদ্দেশ্যে বলে, যাতে সত্য ধর্ম প্রসার লাভ করতে না পারে। মাঝে মাঝে মৌখিক প্রোপাগাণ্ডাও কার্যকর হয়ে যায়। অথবা এটা দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হয়েছে যে, তারা যেন ফুঁৎকারে আল্লাহ্র আলো নিভিয়ে দিতে চায়)। অথচ আল্লাহ্ তাঁর আলোকে পূর্ণতা দান করে ছাড়বেন, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে। (সেমতে) তিনিই তাঁর রসূলকে (আলো পূর্ণ করার জন্য) পথ নির্দেশ (অর্থাৎ কোরআন) ও সত্য ধর্ম দিয়ে (দুনিয়াতে) প্রেরণ করেছেন, যাতে একে (আলোরূপ ইসলামকে অবশিষ্ট) সব ধর্মের উপর প্রবল করে দেন (এটাই পূর্ণতা দান করা) যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শানে-নুযূল ঃ তিরমিযী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ

একদল সাহাবায়ে কিরাম পরস্পরে আলোচনা করলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল কোন্‌টি, আমরা যদি তা জানতে পারতাম, তবে তা বাস্তবায়িত করতাম। বগভী (র) এ প্রসঙ্গে আরও বর্ণনা করেছেন যে, তারা কেউ কেউ একথাও বললেন যে, আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমলটি জানতে পারলে আমরা তজ্জন্য জান ও মাল সব বিসর্জন করতাম।---(মাযহারী)

ইবনে কাসীর মসনদে আহমদের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা একত্রিত হয়ে পরস্পরে এই আলোচনা করার পর একজনকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্য প্রেরণ করতে চাইলেন কিন্তু কারও সাহস হল না। ইতিমধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদেরকে নামে নামে নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। [ফলে বোঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ওহীর মাধ্যমে তাঁদের সমাবেশ ও আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হয়েছেন]। তাঁরা দরবারে উপস্থিত হলে রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদেরকে সমগ্র সূরা সাফ্‌ফ পাঠ করে শুনিয়ে দিলেন, যা তখনই নাযিল হয়েছিল।

এই সূরা থেকে জানা গেল যে, তাঁরা সর্বাধিক প্রিয় যে আমলটির সন্ধানে ছিলেন, সেটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ। তাঁরা এ সম্পর্কে যেসব বড় বড় বুলি আওড়িয়েছিলেন এবং জীবনপণ করার দাবী উচ্চারণ করেছিলেন, সে সম্পর্কেও সূরায় সাথে সাথে তাঁদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, কোন মু'মিনের জন্য এ ধরনের বুলি আওড়ানো দুরস্ত নয়। কারণ, যথাসময়ে সে তার সংকল্প পূর্ণ করতে পারবে কিনা, তা তার জানা নেই। সংকল্প পূর্ণ করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া এবং বাধা অপসারিত হওয়া তার ক্ষমতাধীন নয়। এছাড়া স্বয়ং তার হাত, পা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনকি আন্তরিক সংকল্পও তার কব্জায় নয়। এ কারণেই কোরআন পাকে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কেও শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, আগামীকালের করণীয় কাজ বর্ণনা করতে হলে ইনশাআল্লাহ্ অর্থাৎ যদি আল্লাহ্ চান বলে বর্ণনা করবেন। বলা হয়েছে ঃ

لَا تَقُوْلَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ — সাহাবায়ে কিরামের নিয়ত ও ইচ্ছা বুলি আওড়ানো না হলেও দৃশ্যত তাই বোঝা যাচ্ছিল। আল্লাহ্‌র কাছে এটা পছন্দনীয় নয় যে, কেউ কোন কাজ করার বড় গলায় দাবী করবে, ইনশাআল্লাহ্ বলা ব্যতীত। মোটকথা, তাঁদের হুঁশিয়ার করার জন্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝

এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এই যে, যে কাজ তোমরা করবে না, তা করার দাবী কর কেন? এতে এ ধরনের কাজের দাবী সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা বোঝা গেল, যা করার ইচ্ছাই মানুষের অন্তরে নেই। কারণ, এটা একটা মিথ্যা দাবী বৈ নয়, যা নাম ও যশ অর্জনের খাতিরে

হতে পারে। বলা বাহুল্য, উপরোক্ত ঘটনায় সাহাবায়ে কিরাম যে দাবী করেছিলেন, তা না করার ইচ্ছায় ছিল না। কাজেই এটাও আয়াতের অর্থে অন্তর্ভুক্ত যে, অন্তরে ইচ্ছা ও সংকল্প থাকলেও নিজের উপর ভরসা করে কোন কাজ করার দাবী করা দাসত্বের পরিপন্থী। প্রথমত তা বলারই প্রয়োজন নেই। কাজ করার সুযোগ পেলে কাজ করা উচিত। কোন উপযোগিতা-বশত বলার দরকার হলেও ইন্‌শাআল্লাহ্‌সহ বলতে হবে। তাহলে এটা আর দাবী থাকবে না।

এ থেকে জানা গেল যে, যে কাজ করার ইচ্ছাই নেই, সে কাজের দাবী করা কবীরা গোনাহ্‌ এবং আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির কারণ। যে ক্ষেত্রে অন্তরে কাজটি করার ইচ্ছা থাকে, সেখানেও নিজের শক্তি ও ক্ষমতার উপর ভরসা করে দাবী করা নিষিদ্ধ ও মকরূহ্‌।

দাবী ও দাওয়াতের পার্থক্য ঃ উপরোক্ত তফসীর থেকে জানা গেল যে, দাবীর সাথে এসব আয়াত সম্পৃক্ত অর্থাৎ মানুষ যে কাজ করবে না ; তা করার দাবী করা আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে অসন্তোষজনক। মানুষ যে সৎ কাজ নিজে করে না, সেই সৎ কাজের দাওয়াত, প্রচার ও উপদেশ অন্যকে দেওয়ার বিষয়টি এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ সম্পর্কিত বিধিবিধান অন্যান্য আয়াত ও হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে। উদাহরণত কোরআন বলে ঃ

—أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ—অর্থাৎ তোমরা মানুষকে তো সৎ কাজের আদেশ কর, কিন্তু নিজেকে ভুলে যাও অর্থাৎ নিজে এই সৎ কাজ কর না। এই আয়াত সৎ কাজের আদেশ ও ওয়ায উপদেশ দাতাদেরকে লজ্জা দিয়েছে যে, অন্যকে তো সৎ কাজ করার দাওয়াত দাও, কিন্তু নিজে তা কর না, এটা লজ্জার কথা। উদ্দেশ্য এই যে, অপরকে উপদেশ দেওয়ার পূর্বে নিজেকে উপদেশ দাও এবং অপরকে যে কাজ করতে বল, নিজেও তা কর।

কিন্তু একথা বলা হয়নি যে, নিজে যখন কর না, তখন অপরকেও করতে বলো না। এ থেকে জানা গেল যে, যে সৎ কাজ নিজে করার সাহস ও তওফীক নেই, তার প্রতি অপরকে উদ্বুদ্ধ করতে ও উপদেশ দিতে ত্রুটি করা উচিত নয়। আশা করা যায় যে, এই উপদেশের কল্যাণে কোন সময় তার নিজেরও এ কাজ করার তওফীক হয়ে যাবে। বিস্তর অভিজ্ঞতা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তবে সে কাজটি যদি ওয়াজিব অথবা সুন্নতে-মোয়াক্কাদাহ্‌ পর্যায়ের হয়, তবে উপরোক্ত আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করে মনে মনে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়াও ওয়াজিব। মোস্তাহাব পর্যায়ের হলে অনুতাপ করাও মোস্তাহাব।

পরের আয়াতে এই সূরা অবতরণের আসল কারণ বিবৃত হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল কোন্‌টি? এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

—إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ

অর্থাৎ যুদ্ধের সেই কাতার আল্লাহ্‌র কাছে প্রিয়, যা আল্লাহ্‌র শত্রুদের মুকাবিলায় তাঁর

বাণী সমুন্নত করার জন্য কায়েম করা হয় এবং মুজাহিদদের অসাধারণ দৃঢ়তা ও সাহসিকতার কারণে তা একটি সীসা গলানো দুর্ভেদ্য প্রাচীরের রূপ পরিগ্রহ করে।

এরপর হযরত মূসা ও ঈসা (আ)-র আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ এবং শত্রুদের নির্যাতন সহ্য করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর পুনরায় মুসলমানদেরকে জিহাদ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এখানে বর্ণিত হযরত মূসা ও ঈসা (আ)-র ঘটনাবলীতেও অনেক শিক্ষাগত ও কর্মগত উপকারিতা এবং দিক-নির্দেশ রয়েছে। হযরত ঈসা (আ)-র কাহিনীতে আছে যে, তিনি যখন বনী ইসরাঈলকে তাঁর নবুয়ত মেনে নেওয়ার ও আনুগত্য করার দাওয়াত দেন, তখন বিশেষভাবে দুটি বিষয় উল্লেখ করেন। এক. তিনি কোন অভিনব রসূল নন এবং অভিনব বিষয় নিয়ে আগমন করেন নি; বরং এমন সব বিষয় নিয়ে এসেছেন, যা পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ এ পর্যন্ত বলে এসেছেন এবং পূর্ববর্তী ঐশী কিতাবে উল্লিখিত আছে। পরে যে সর্বশেষ পয়গম্বর আগমন করবেন, তিনিও এ ধরনের দিক-নির্দেশ নিয়ে আসবেন।

এখানে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে তওরাতের উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, বনী ইসরাঈলের প্রতি অবতীর্ণ নিকটতম কিতাব এটিই ছিল। নতুবা পয়গম্বরগণ পূর্ববর্তী সব কিতাবেরই সত্যায়ন করেছেন। এ ছাড়া এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ঈসা (আ)-র শরীয়ত যদিও স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ কিন্তু তার অধিকাংশ বিধিবিধান মূসা (আ)-র শরীয়ত ও তওরাতের অনুরূপ। স্বল্প সংখ্যক বিধানই পরিবর্তন করা হয়েছে মাত্র।

হযরত ঈসা (আ) দ্বিতীয় বিষয় এই উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাঁর পরে আগমনকারী রসূলের সুসংবাদ শুনিয়েছেন। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তাঁর দিক-নির্দেশও তদনুরূপ হবে। তাই তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাও বুদ্ধি এবং সততার দাবী।

সাথে সাথে তিনি বনী ইসরাঈলকে পরে আগমনকারী রসূলের নামঠিকানাও ইঞ্জীলে বলে দিয়েছেন। এভাবে বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি যখন আগমন করবেন, তখন তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও তাঁর আনুগত্য করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য হবে। مُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهٗ اَحْمَدُ — বাক্যে তাই বর্ণিত হয়েছে। এতে সেই রসূলের নাম বলা হয়েছে আহ্‌মদ। আমাদের প্রিয় শেষ নবী (সা)-র মুহাম্মদ, আহমদ এবং আরও কয়েকটি নাম ছিল। কিন্তু ইঞ্জীলে তাঁর নাম আহমদ উল্লেখ করার উপযোগিতা সম্ভবত এই যে, আরবে প্রাচীনকাল থেকেই মুহাম্মদ নাম রাখার প্রচলন ছিল। ফলে এই নামের আরও লোক আরবে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আহমদ নাম আরবে প্রচলিত ও সুবিদিত ছিল না। এটা একমাত্র রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিশেষ নাম ছিল।

ইঞ্জীলে রসূলে করীম (সা)-এর সুসংবাদ ঃ একথা সুবিদিত এবং স্বয়ং ইহুদী ও খৃস্টানরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, তওরাত ও ইঞ্জীলের বিষয়বস্তু বিকৃত হয়েছে। সত্য বলতে কি, এই কিতাবদ্বয়ে এত বেশি পরিবর্তন হয়েছে যে,এখন প্রকৃত কালাম চিনাও দুষ্কর হয়ে পড়েছে। বর্তমান বিকৃত ইঞ্জীলের ভিত্তিতে আজকালকার খৃস্টানরা কোরআনের

এই বক্তব্য স্বীকার করে না যে, ইঞ্জীলে কোথাও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নাম আহমদ উল্লেখ করে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এর সংক্ষিপ্ত ও যথেষ্ট জওয়াব উল্লেখ করা হয়েছে।

বিস্তারিত জওয়াবের জন্য হযরত মাওলানা 'রহমতুল্লাহ্' কেরানভীর কিতাব 'এযহারুল হক' পাঠ করা দরকার। এটা খৃস্টধর্মের স্বরূপ, ইঞ্জীলে পরিবর্তন এবং পরিবর্তন সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সুসংবাদ ইঞ্জীলে বিদ্যমান থাকা সম্পর্কেও একটা নযীরবিহীন কিতাব। বড় বড় খৃস্টান পণ্ডিতদের এই উক্তিও মুদ্রিত আছে যে, এই কিতাব প্রকাশিত হতে থাকলে কখনও খৃস্টধর্মের প্রচার ও প্রসার হতে পারবে না।

এই কিতাব আরবী ভাষায় লিখিত হয়েছিল। পরে তুর্কী এবং ইংরেজী ভাষায়ও এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি দারুল উলূম করাচী থেকে এর উর্দূ অনুবাদও তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ
اَلِيْمٍ ۝ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ يَغْفِرْ
لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَ
مَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ۭ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝ وَاُخْرٰى
تُحِبُّوْنَهَا ۭ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ۭ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ يٰٓاَيُّهَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْٓا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ
لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۭ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ
فَاٰمَنَتْ طَّاۗىِٕفَةٌ مِّنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ وَكَفَرَتْ طَّاۗىِٕفَةٌ ۚ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا عَلٰي عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ ۝

(১০) হে মু'মিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দেব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? (১১) তা এই যে, তোমরা আল্লাহ্ ও তার রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহ্র পথে নিজেদের ধনসম্পদ ও জীবনপণ

করে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম; যদি তোমরা বুঝ। (১২) তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং এমন জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং বসবাসের জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। এটা মহাসাফল্য। (১৩) এবং আরও একটি অনুগ্রহ দেবেন, যা তোমরা পছন্দ কর। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। মু'মিনদেরকে এর সুসংবাদ দান করুন। (১৪) হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী হয়ে যাও, যেমন ঈসা ইবনে মরিয়ম তার শিষ্যবর্গকে বলেছিল, আল্লাহ্‌র পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে? শিষ্যবর্গ বলেছিল ঃ আমরা আল্লাহ্‌র পথে সাহায্যকারী। অতঃপর বনী ইসরাঈলের একদল বিশ্বাস স্থাপন করল এবং একদল কাফির হয়ে গেল। যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, আমি তাদেরকে তাদের শত্রুদের মুকাবিলায় শক্তি যোগালাম, ফলে তারা বিজয়ী হল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(প্রথমে জিহাদের পরকালীন ফলাফল ও পরে ইহকালীন ফলাফলের ওয়াদা করে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করা হচ্ছে ঃ) মু'মিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দেব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? (তা এই যে) তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের ধনসম্পদ ও জীবনপণ করে জিহাদ করবে। এটা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ। (এরূপ করলে) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে (জান্নাতের) এমন উদ্যানে দাখিল করবেন, যা চিরকাল বসবাসের উদ্যানে (নির্মিত) হবে। এটা মহাসাফল্য। (এই সত্যিকার পরকালীন ফলাফল ছাড়াও) আরও একটি (ইহকালীন) ফলাফল আছে, যা তোমরা (বিশেষভাবে) পছন্দ কর (অর্থাৎ) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। (এটা পছন্দনীয় হওয়ার কারণ এই যে, মানুষ স্বভাবগতভাবে দ্রুত ফলাফল কামনা করে। হে পয়গম্বর, আপনি) মু'মিনগণকে এর সুসংবাদ দান করুন। [সাহায্য ও বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী একের পর এক ইসলামী বিজয়ের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। অতঃপর ঈসা (আ)-র শিষ্যবর্গের কাহিনী বর্ণনা করে ধর্মের সাহায্যের প্রতি উৎসাহিত করা হচ্ছে ঃ] মু'মিনগণ তোমরা আল্লাহ্‌র (দীনের) সাহায্যকারী হয়ে যাও (অর্থাৎ জিহাদের মাধ্যমে)। যেমন [ঈসা (আ)-র শিষ্যবর্গ দীনের সাহায্যকারী হয়েছিল। তখন বহু সংখ্যক লোক ঈসা (আ)-র শত্রু ছিল]। ঈসা ইবনে মরিয়ম তাঁর শিষ্যবর্গকে বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্‌র পথে কে আমার সাহায্যকারী? শিষ্যবর্গ বলেছিল ঃ আমরা আল্লাহ্‌র (দীনের) সাহায্যকারী। সে মতে তারা দীন প্রচারে চেষ্টা করে দীনের সাহায্য করেছিল। অতঃপর (এই চেষ্টার পর) বনী ইসরাঈলের একদল বিশ্বাস স্থাপন করল এবং একদল কাফির হয়ে গেল। (এরপর তাদের মধ্যে শত্রুতা ও গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে অথবা ধর্মীয় বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছে) অতএব, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, আমি তাদেরকে তাদের শত্রুদের মুকাবিলায় শক্তিশালী করলাম, ফলে তারা বিজয়ী হল। (তোমরাও এমনিভাবে দীনে মুহাম্মদীর জন্য চেষ্টা ও জিহাদ কর। উপরোক্ত গৃহযুদ্ধের

সূচনা যদি কাফিরদের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তবে এতে খৃস্টধর্মে জিহাদের অস্তিত্ব জরুরী হয় না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ

এই আয়াতে ঈমান এবং ধনসম্পদ ও জীবনপণ করে জিহাদ করাকে বাণিজ্য আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কারণ, বাণিজ্যে যেমন কিছু ধনসম্পদ ও শ্রম ব্যয় করার বিনিময়ে মুনাফা অর্জিত হয়, তেমনি ঈমান সহকারে আল্লাহ্র পথে জান ও মাল ব্যয় করার বিনিময়ে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও পরকালের চিরস্থায়ী নিয়ামত অর্জিত হয়। পরবর্তী আয়াতে তাই বলা হয়েছে যে, যে এই বাণিজ্য অবলম্বন করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার গোনাহ্ মাফ করবেন এবং জান্নাতে উৎকৃষ্ট বাসগৃহ দান করবেন। এসব বাসগৃহে সর্বপ্রকার আরাম ও বিলাস ব্যসনের সরঞ্জাম থাকবে। অতঃপর পরকালীন নিয়ামতের সাথে কিছু ইহকালীন নিয়ামতেরও ওয়াদা করা হয়েছে ঃ

وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ — اُخْرٰى শব্দটি نعمت-

এর বিশেষণ। অর্থ এই যে, পরকালীন নিয়ামত ও বাসগৃহ তো পাওয়া যাবেই; ইহকালেও একটি নগদ নিয়ামত পাওয়া যাবে, তা হচ্ছে আল্লাহ্র সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। অর্থাৎ শত্রুদেশ বিজিত হওয়া। এখানে قريب শব্দটি পরকালের বিপরীতে ধরা হলে ইসলামের সকল বিজয়ই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর যদি প্রচলিত قريب ধরা হয়, তবে এর প্রথম অর্থ হবে খায়বর বিজয় এবং এরপর মক্কা বিজয়। تُحِبُّوْنَهَا অর্থাৎ তোমরা এই নগদ নিয়ামত খুব পছন্দ কর। কারণ, মানুষ স্বভাবগতভাবে নগদকে পছন্দ করে। কোরআনে বলা হয়েছে ঃ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا অর্থাৎ মানুষ তড়িঘড়ি পছন্দ করে। এর অর্থ এই নয় যে, পরকালীন নিয়ামত তাদের কাছে প্রিয় নয়। বরং অর্থ এই যে, পরকালের নিয়ামত তো তাদের প্রিয় কাম্যই কিন্তু স্বভাবগতভাবে কিছু নগদ নিয়ামতও তারা দুনিয়াতে চায়। তাও দেওয়া হবে।

كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِىْ اِلَى اللّٰهِ—

حواريين শব্দটি حوارى-এর বহুবচন। এর অর্থ আন্তরিক বন্ধু। যারা ঈসা (আ)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তাদেরকে حوارى বলা হত। সূরা আল-ইমরানে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের সংখ্যা ছিল বারজন। এই আয়াতে ঈসা (আ)-র আমলের একটি ঘটনা

উল্লেখ করে মুসলমানদেরকে আল্লাহ্র দীনের সাহায্যের জন্য তৈরী হতে উৎসাহিত করা হয়েছে। হযরত ঈসা (আ) শত্রুদের উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে বলেছিলেনঃ

مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ অর্থাৎ আল্লাহ্র দীন প্রচারে কে আমার সাহায্যকারী হবে? প্রত্যুত্তরে বারজন লোক আনুগত্যের শপথ করে এবং খৃস্টধর্ম প্রচারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। অতএব, মুসলমানদেরকেও আল্লাহ্র দীন প্রচারে সাহায্যকারী হওয়া উচিত।

সাহাবায়ে কিরাম এই আদেশ পালনে বিশ্বের ইতিহাসে অনন্য নযীর স্থাপন করেন। তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সা) ও দীনের খাতিরে সারা বিশ্বের শত্রুতা বরণ করে নেন, অকথ্য নির্যাতন সহ্য করেন এবং নিজেদের ধনসম্পদ ও জীবন বিসর্জন দেন। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে বিজয় ও সাহায্য দ্বারা ভূষিত করেন এবং শত্রুদের মুকাবিলায় প্রাধান্য দান করেন। বহু শত্রুদেশ তাঁদের করতলগত হয় এবং তাঁরা রাষ্ট্রীয় শাসনক্ষমতাও অর্জন করেন।

فَآمَنَت طَّائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ ۝ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ -

খৃস্টানদের তিন দলঃ বগভী (র) এই আয়াতের তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, ঈসা (আ) আসমানে উত্থিত হওয়ার পর খৃস্টান জাতি তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল বললঃ তিনি আল্লাহ্ ছিলেন এবং আসমানে চলে গেছেন। দ্বিতীয় দল বললঃ তিনি আল্লাহ্ ছিলেন না বরং আল্লাহ্র পুত্র ছিলেন। এখন আল্লাহ্ তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং শত্রুদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তৃতীয় দল বিশুদ্ধ ও সত্য কথা বলল। তারা বললঃ তিনি আল্লাহ্ও ছিলেন না, আল্লাহ্র পুত্রও ছিলেন না বরং আল্লাহ্র দাস ও রসূল ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে শত্রুদের কবল থেকে হিফাযত ও উচ্চ মর্তবা দান করার জন্য আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন। তারাই ছিল সত্যিকার ঈমানদার। প্রত্যেক দলের সাথে কিছু কিছু জনসাধারণও যোগদান করে এবং পারস্পরিক কলহ বাড়তে বাড়তে যুদ্ধের উপক্রম হয়। ঘটনাচক্রে উভয় কাফির দল মু'মিনদের মুকাবিলায় প্রবল হয়ে উঠে। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশেষ পয়গম্বর (সা)-কে প্রেরণ করেন। তিনি মু'মিন দলকে সমর্থন দেন। এভাবে পরিণামে মু'মিন দল যুক্তিপ্রমাণের নিরিখে বিজয়ী হয়ে যায়। ---(মাযহারী)

এই তফসীর অনুযায়ী الَّذِينَ آمَنُوا বলে ঈসা (আ)-র উম্মতের মু'মিন-গণকেই বোঝানো হয়েছে, যারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাহায্য ও সমর্থনে বিজয়-গৌরব অর্জন করবে।---(মাযহারী) কেউ কেউ বলেনঃ ঈসা (আ)-র আসমানে উত্থিত হওয়ার পর

খৃস্টানদের মধ্যে দুই দল হয়ে যায়। একদল ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্ অথবা আল্লাহ্‌র পুত্র আখ্যায়িত করে মুশরিক হয়ে যায় এবং অপর দল বিশুদ্ধ ও খাঁটি দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তারা ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্‌র দাস ও রসূল মান্য করে। এরপর মুশরিক ও মু'মিন দলের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হলে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে কাফির দলের বিরুদ্ধে বিজয়ী করেন। কিন্তু একথাই প্রসিদ্ধ যে, ঈসা (আ)-র ধর্মে জিহাদ ও যুদ্ধের বিধান ছিল না। তাই মু'মিন দলের যুদ্ধ করার কথা অবান্তর মনে হয়। ---(রূহুল-মা'আনী) উপরে তফসীরের সার-সংক্ষেপে এর জওয়াবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সম্ভবত যুদ্ধের সূচনা কাফির খৃস্টানদলের পক্ষ থেকে হয়েছিল এবং মু'মিনরা প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল। এটা প্রকৃতপক্ষে জিহাদ ও যুদ্ধের মধ্যে পড়ে না।

سورة الجمعة

সূরা জুমু'আ

মদীনায় অবতীর্ণ, ১১ আয়াত, ২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ
الْحَكِيْمِ ○ هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ
وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ
مُّبِيْنٍ ○ وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○ ذٰلِكَ
فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○ مَثَلُ
الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ۗ
بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظّٰلِمِيْنَ ○ قُلْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْٓا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ
مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهٗٓ
اَبَدًا ۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ○ قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ
الَّذِيْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○ ع

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) রাজ্যাধিপতি, পবিত্র, পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে, যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে ও যা কিছু আছে ভূমণ্ডলে। (২) তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য

থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত। (৩) এই রসূল প্রেরিত হয়েছেন অন্য আরও লোকদের জন্য, যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৪) এটা আল্লাহ্‌র কৃপা, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। আল্লাহ্ মহাকৃপাশীল। (৫) যাদেরকে তওরাত দেওয়া হয়েছিল, অতঃপর তারা তার অনুসরণ করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত সেই গাধা, যে পুস্তক বহন করে। যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তাদের দৃষ্টান্ত কত নিকৃষ্ট। আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। (৬) বলুন---হে ইহুদীগণ, যদি তোমরা দাবী কর যে, তোমরাই আল্লাহ্‌র বন্ধু---অন্য কোন মানব নয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (৭) তারা নিজেদের কৃতকর্মের কারণে কখনও মৃত্যু কামনা করবে না। আল্লাহ্ জালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। (৮) বলুন, তোমরা যে মৃত্যু থেকে পলায়ন কর, সেই মৃত্যু অবশ্যই তোমাদের মুখোমুখি হবে, অতঃপর তোমরা অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহ্‌র কাছে উপস্থিত হবে। তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন সেই সব কর্ম, যা তোমরা করতে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

রাজ্যাধিপতি, পবিত্র, পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে (মুখে অথবা অবস্থার মাধ্যমে) যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে এবং যা কিছু আছে ভূমণ্ডলে। তিনিই (আরবের) নিরক্ষরদের মধ্যে তাদেরই (সম্প্রদায়ের) মধ্য থেকে একজন পয়গম্বর প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তাদেরকে (ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুচরিত্র থেকে) পবিত্র করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন (সব ধর্মীয় জরুরী জ্ঞান এর অন্তর্ভুক্ত)। ইতিপূর্বে (অর্থাৎ তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে) তারা প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত ছিল। (অর্থাৎ শিরক ও কুফরে লিপ্ত ছিল। মানে অধিকাংশ লোক লিপ্ত ছিল। কেননা, মূর্খতা যুগেও কিছুসংখ্যক একত্ববাদী বিদ্যমান ছিল)। এই রসূল অন্য আরও লোকদের জন্য প্রেরিত হয়েছেন, যারা (মুসলমান হয়ে) তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে কিন্তু এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি (ইসলাম গ্রহণ না করার কারণে অথবা তারা এখনও জন্মগ্রহণই করেনি। এতে কিয়ামত পর্যন্ত আরব-অনারব সব লোক অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। মুসলমান সব ইসলামের সম্পর্কে এক ও অভিন্ন, তাই তাদেরকে منهم বলা হয়েছে।---(খাযেন) তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। (তাই এমন নবী প্রেরণ করেছেন)। এটা (অর্থাৎ রসূলের মাধ্যমে পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্তি পেয়ে কিতাব ও হিদায়তের দিকে আসা) আল্লাহ্ তা'আলার কৃপা, তিনি যাকে ইচ্ছা, তা দান করেন। আল্লাহ্ মহাকৃপাশীল। (সবাইকে দিলেও দিতে পারেন, কিন্তু তিনি স্বীয় প্রজ্ঞাবলে যাকে ইচ্ছা দেন এবং বঞ্চিত রাখেন। উপরে নিরক্ষরদের মু'মিন হওয়া এবং ইহুদী আলিমদের মু'মিন না হওয়া থেকে এ কথা সুস্পষ্ট। অতঃপর রিসালত অমান্যকারীদের নিন্দায় বলা হচ্ছে ঃ) যাদেরকে তওরাত মেনে চলতে বলা

হয়েছিল, অতঃপর তারা তা মেনে চলেনি, তাদের দৃষ্টান্ত সেই গাধা, যে পুস্তক বহন করে (কিন্তু পুস্তকের উপকার পায় না। তেমনিভাবে জ্ঞানের আসল উদ্দেশ্য ও উপকার হচ্ছে তদনুযায়ী কাজ করা। এটা না হলে জ্ঞানার্জন পণ্ডশ্রম মাত্র। জন্তুদের মধ্যে গাধা প্রসিদ্ধ বেওকুফ। তাই বিশেষভাবে একে উল্লেখ করে অধিক ঘৃণা প্রকাশ করা হয়েছে)। যারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে মিথ্যা বলে তাদের দৃষ্টান্ত কত নিকৃষ্ট (যেমন এই ইহুদীরা)। আল্লাহ্ তা'আলা জালিম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।] কারণ তারা জেনে-বুঝে হঠকারিতা করে। হঠকারিতা ত্যাগ করলেই তাদের পথপ্রদর্শন হবে। তওরাত মেনে চলার জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা জরুরী। সুতরাং বিশ্বাস স্থাপন না করা তওরাত অমান্য করার নামান্তর। যদি তারা বলে যে, তারা এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্‌র প্রিয়, তবে] আপনি বলুন ঃ হে ইহুদীগণ, যদি তোমরা দাবী কর যে, তোমরাই আল্লাহ্‌র বন্ধু---অন্য মানুষ নয়, তবে (এর সত্যায়নের জন্য) তোমরা মৃত্যু কামনা কর যদি তোমরা (এই দাবীতে) সত্যবাদী হও। (আমি সাথে সাথে এ কথাও বলে দিচ্ছি যে) তারা নিজেদের কৃতকর্মের কারণে (অর্থাৎ শাস্তির ভয়ে) কখনও মৃত্যু কামনা করবে না। আল্লাহ্ জালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। (বিচারের দিন আসলে অপরাধের বিবরণ শুনিয়ে শাস্তির আদেশ দেবেন। শাস্তির এই প্রতিশ্রুতিকে জোরদার করার জন্য আপনি একথাও) বলুন ঃ তোমরা যে মৃত্যু থেকে পলায়ন কর, (এবং বন্ধুত্ব দাবী করা সত্ত্বেও শাস্তির ভয়ে যা কামনা কর না) সেই মৃত্যু (একদিন) অবশ্যই তোমাদের মুখোমুখি হবে। অতঃপর তোমরা অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহ্‌র কাছে নীত হবে। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম জানিয়ে দেবেন (এবং শাস্তি দেবেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ---কোরআন পাকে যেসব সূরা يُسَبِّحُ ও سَبَّحَ শব্দ দ্বারা শুরু হয়, সেগুলোকে 'মুসাব্বিহাত' বলা হয়।

এসব সূরায় নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর জন্য আল্লাহ্‌র পবিত্রতা পাঠ সপ্রমাণ করা হয়েছে। অবস্থার মাধ্যমে এই পবিত্রতা পাঠ সবারই বোধগম্য। কারণ, সৃষ্ট জগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু তার প্রজ্ঞাময় স্রষ্টার প্রজ্ঞা ও অপার শক্তি-সামর্থ্যের সাক্ষ্যদাতা। এটাই তার পবিত্রতা পাঠ। নির্ভুল সত্য এই যে, প্রত্যেক বস্তু তার নিজস্ব ভঙ্গিতে আক্ষরিক অর্থেও পবিত্রতা পাঠ করে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক জড় ও অজড় পদার্থের মধ্যে তার সাধ্যানুযায়ী চেতনা ও অনুভূতি রেখেছেন। এই চেতনা ও অনুভূতির অপরিহার্য দাবী হচ্ছে পবিত্রতা পাঠ। কিন্তু এসব বস্তুর পবিত্রতা পাঠ মানুষ শ্রবণ করে না। তাই কোরআনে বলা হয়েছে ঃ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ---অধিকাংশ

সূরার শুরুতে অতীত পদবাচ্যে سَبَّحَ বলা হয়েছে। কেবল সূরা জুমু'আ ও সূরা তাগাবুনে ভবিষ্যৎ পদবাচ্যে يُسَبِّحُ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে ভাষাগত অলংকার এই যে, অতীত পদবাচ্যে নিশ্চয়তা বোঝায়। এ কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাই ব্যবহৃত হয়েছে। ভবিষ্যৎ পদবাচ্য সদাসর্বদা হওয়া বোঝায়। এই অর্থ বোঝাবার জন্য দুই জায়গায় এই পদ ব্যবহার করা হয়েছে।

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا—اُمِّيّٖن শব্দটি اُمِّى এর বহুবচন। এর অর্থ নিরক্ষর। আরবরা এই পদবীতে সুবিদিত। কারণ, তাদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রচলন ছিল না। লেখাপড়া জানা লোক খুব কম ছিল। এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার মহাশক্তি প্রকাশ করার জন্য বিশেষভাবে আরবদের জন্য এই পদবী অবলম্বন করা হয়েছে এবং এ কথাও বলা হয়েছে যে, প্রেরিত রসূলও তাদেরই একজন অর্থাৎ নিরক্ষর। কাজেই এটা বিস্ময়কর ব্যাপার যে, গোটা জাতি নিরক্ষর এবং তাদের কাছে যে রসূল প্রেরিত হয়েছেন, তিনিও নিরক্ষর। অথচ যেসব কর্তব্য এই রসূলকে সোপর্দ করা হয়েছে, সেগুলো সবই এমন শিক্ষামূলক ও সংস্কারমূলক যে, কোন নিরক্ষর ব্যক্তি এগুলো শিক্ষা দিতে পারে না এবং কোন নিরক্ষর জাতি এগুলো শিখার যোগ্য নয়।

একে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তিবলে রসূলে করীম (সা)-এর অলৌকিক ক্ষমতাই আখ্যা দেওয়া যায় যে, তিনি যখন শিক্ষা ও সংস্কারের কাজ শুরু করেন, তখন এই নিরক্ষরদের মধ্যেই এমন সুপণ্ডিত ও দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটল, যাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, বুদ্ধি ও কুশলতা এবং উৎকৃষ্ট কর্মপ্রতিভা সারা বিশ্বের স্বীকৃতি ও প্রশংসা কুড়িয়েছে।

পয়গম্বর প্রেরণের তিন উদ্দেশ্য ঃ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ—এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত বর্ণনা প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র তিনটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে ঃ এক. কোরআনের আয়াত তিলাওয়াত, দুই. উম্মতকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল প্রকার অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করা, তিন. কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেওয়া।

এই তিনটি বিষয়ই উম্মতের জন্য যেমন আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত, তেমনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রেরণ করার উদ্দেশ্যেরও অন্তর্ভুক্ত।

يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهٖ—تِلَاوَت-এর আসল অর্থ অনুসরণ করা। পরিভাষায় শব্দটি আল্লাহ্‌র কালাম পাঠ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। اٰيَات বলে কোরআনের আয়াত বোঝানো হয়েছে। عَلَيْهِمْ শব্দে বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রেরণ করার এক উদ্দেশ্য এই যে, তিনি মানুষকে কোরআনের আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনাবেন।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য يُزَكِّيهِمْ — এটা تَزْكِيَةٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ পবিত্র করা। অভ্যন্তরীণ দোষ থেকে পবিত্র করার অর্থে অধিকতর ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ কুফর, শিরক ও কুচরিত্রতা থেকে পবিত্র করা। কোন সময় বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সর্বপ্রকার পবিত্রতার জন্যও ব্যবহৃত হয়। এখানে এই ব্যাপক অর্থই উদ্দেশ্য।

তৃতীয় উদ্দেশ্য يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ——'কিতাব' বলে কোরআন পাক এবং 'হিকমত' বলে রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত উক্তিগত ও কর্মগত শিক্ষাসমূহ বোঝানো হয়েছে। তাই অনেক তফসীরকার এখানে হিক মতের তফসীর করেছেন সুন্নাহ্ ।

একটি প্রশ্ন ও উত্তর ঃ এখানে প্রশ্ন হয় যে, তিলাওয়াতের পরই কিতাব শিক্ষাদানের কথা এবং এরপর পবিত্র করার কথা উল্লেখ করা বাহ্যত সঙ্গত ছিল। কেননা, এই বিষয়-ত্রয়ের স্বাভাবিক ক্রম তাই। প্রথমে তিলাওয়াত অর্থাৎ ভাষা ও অর্থ সম্ভার শিক্ষা দেওয়া হয়। এর পরিণতিতে কর্ম ও চরিত্র সংশোধনের পালা আসে। কোরআন পাকে এই আয়াত কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। অধিকাংশ জায়গায় স্বাভাবিক ক্রম পরিবর্তন করে তিলাওয়াত ও শিক্ষাদানের মাঝখানে তাযকিয়া তথা কর্ম ও চরিত্র সংশোধনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

রূহুল-মা'আনীতে এর জওয়াবে বলা হয়েছে, যদি স্বাভাবিক ক্রম অবলম্বন করা হত, তবে এই বিষয়ত্রয় মিলে এক-একটি স্বতন্ত্র বিষয় হত, যেমন চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্রে কয়েক প্রকার ঔষধের সমষ্টিকে একই ঔষধ বলা হয়ে থাকে। এখানেও এই সত্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, এই বিষয়ত্রয়ে আলাদাভাবে স্বতন্ত্র নিয়ামত এবং পৃথক পৃথকভাবে রিসালতের কর্তব্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। ক্রম পরিবর্তন করার ফলে এদিকে ইঙ্গিত হতে পারে।

সূরা বাকারায় এই আয়াতের বিস্তারিত তফসীর অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়সহ বর্ণিত হয়েছে।

وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ — آخرين

এর শাব্দিক অর্থ অন্য লোক। لما يلحقوا بهم -এর অর্থ যারা এখন পর্যন্ত তাদের অর্থাৎ নিরক্ষরদের সাথে মিলিত হয়নি। এখানে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলমানকে বোঝানো হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলমানকে প্রথম কাতারের মু'মিন অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরামের সাথে সংযুক্ত মনে করা হবে। এটা নিঃসন্দেহে পরবর্তী মুসলমানদের জন্য সুসংবাদ ---(রূহুল-মা'আনী)

কেউ কেউ آخرين শব্দটিকে اميين -এর উপর عطف করেছেন। এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূলকে নিরক্ষরদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে প্রেরণ করেছেন, যারা এখনও নিরক্ষরদের সাথে মিলিত হয়নি। এখানে প্রশ্ন হয় যে, উপস্থিত লোকদের মধ্যে রসূল প্রেরণ করার বিষয়টি বোধগম্য কিন্তু যারা এখনও দুনিয়াতে আগমনই

করেনি, তাদের মধ্যে রসূল প্রেরণ করার মানে কি? বয়ানুল-কোরআনে বলা হয়েছে, তাদের মধ্যে প্রেরণ করার অর্থ তাদের জন্য প্রেরণ করা فى শব্দটি আরবী ভাষায় এই অর্থেও আসে।

কেউ কেউ اٰخرين শব্দের عطف মেনেছেন يعلمهم -এর সর্বনামের উপর। এর অর্থ এই হবে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) শিক্ষা দেন নিরক্ষরদেরকে এবং তাদেরকে যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি।---(মাযহারী)

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে বসা ছিলাম, এমতাবস্থায় সূরা জুমু'আ অবতীর্ণ হয়। তিনি আমাদেরকে তা পাঠ করে শুনান। তিনি وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ পাঠ করলে আমরা আরয করলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এরা কারা? তিনি নিরুত্তর রইলেন। দ্বিতীয় বার, তৃতীয় বার প্রশ্ন করার পর তিনি পার্শ্বে উপবিষ্ট সালমান ফারসী (রা)-র গায়ে হাত রাখলেন এবং বললেন ঃ যদি ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রের সমান উচ্চতায়ও থাকে, তবে তার সম্প্রদায়ের কিছু লোক সেখান থেকেও ঈমানকে নিয়ে আসবে।---(মাযহারী)

এই রেওয়ায়েতেও পারস্যবাসীদের কোন বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হয় না বরং এতটুকু বোঝা যায় যে, তারাও اٰخرين অর্থাৎ অন্য লোকদের সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত। এই হাদীসে অনারবদের যথেষ্ট ফযীলত ব্যক্ত হয়েছে।---(মাযহারী)

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا

سفر শব্দটি اسفار -এর বহুবচন। এর অর্থ বড় পুস্তক। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে নিরক্ষর লোকদের মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আবির্ভাব ও নবুয়ত এবং তাঁকে প্রেরণ করার তিনটি উদ্দেশ্য যে ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে, তওরাতেও তা প্রায় একই ভাষায় বিবৃত হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখামাত্রই তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ইহুদীদের উচিত ছিল। কিন্তু পার্থিব জাঁকজমক ও ধনৈশ্বর্য তাদেরকে তওরাত থেকে বিমুখ করে রেখেছে। ফলে তারা তওরাতের পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও তওরাতের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ মূর্খ ও অনভিজ্ঞের পর্যায়ে চলে এসেছে। আলোচ্য আয়াতে তাদের নিন্দা করে বলা হয়েছে যে, যাদেরকে তওরাতের বাহক করা হয়েছিল অর্থাৎ অযাচিতভাবে আল্লাহ্র এই নিয়ামত দান করা হয়েছিল, তারা যথাযথভাবে একে বহন করেনি অর্থাৎ তারা তওরাতের নির্দেশাবলীর পরোয়া করেনি। ফলে তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে গর্দভ, যার পিঠে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বৃহদাকার গ্রন্থ চাপিয়ে দেওয়া হয়। এই গর্দভ সেই বোঝা বহন তো করে কিন্তু তার বিষয়বস্তুর কোন খবর রাখে না এবং তাতে তার কোন উপকারও হয় না। ইহুদীদের অবস্থাও তদ্রূপ। তারা পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনের জন্য তওরাতকে বহন করে এবং এর মাধ্যমে জনগণের মধ্যে জাঁকজমক ও প্রতিপত্তি লাভ করতে চায় কিন্তু এর দিক নির্দেশ দ্বারা কোন উপকার লাভ করে না।

তফসীরবিদগণ বলেন ঃ যে আলিম তার ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করে না, তার দৃষ্টান্তও ইহুদীদের দৃষ্টান্তের অনুরূপ।

نہ محقق بود نہ دانشمند
چارپائے بروکتابے چند

আমলহীন আলিম চিন্তাবিদ ও সুধীজন কোনটাই নয়—সে কয়েকটি কিতাব বহনকারী চতুষ্পদ জন্তু মাত্র।

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○

ইহুদীরা তাদের কুফর, শিরক ও চরিত্রহীনতা সত্ত্বেও দাবী করত যে, نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ অর্থাৎ আমরা তো আল্লাহ্‌র সন্তান-সন্ততি ও প্রিয়জন। তারা নিজেদের ব্যতীত অন্য কাউকে জান্নাতের যোগ্য অধিকারী মনে করত না বরং তাদের বক্তব্য ছিল ঃ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا—অর্থাৎ ইহুদী না হয়ে কেউ জান্নাতে দাখিল হতে পারবে না। তারা যেন নিজেদেরকে পরকালের শাস্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত মনে করত এবং জান্নাতের নিয়ামতসমূহকে তাদের ব্যক্তিগত জায়গীর মনে করত। বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, পরকালের নিয়ামতসমূহ ইহকালের নিয়ামত অপেক্ষা হাজারো গুণে শ্রেষ্ঠ এবং সে আরও বিশ্বাস করে যে, মৃত্যুর পরই সে এসব মহান ও চিরন্তন নিয়ামত অবশ্যই লাভ করবে, তার মধ্যে সামান্যতম বিবেক-বুদ্ধি থাকলে সে অবশ্যই মনেপ্রাণে মৃত্যু কামনা করবে। তার আন্তরিক বাসনা হবে যে, মৃত্যু শীঘ্র আসুক, যাতে সে দুনিয়ার মলিন ও দুঃখ-বিষাদে পূর্ণ জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে অকৃত্রিম সুখ ও শান্তির চিরকালীন জীবনে প্রবেশ করতে পারে।

তাই আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঃ আপনি ইহুদীদেরকে বলুন, যদি তোমরা দাবী কর যে, সমগ্র মানবজাতির মধ্যে একমাত্র তোমরাই আল্লাহ্‌র বন্ধু ও প্রিয়পাত্র এবং পরকালের আযাব সম্পর্কে তোমরা মোটেই কোন আশংকা না কর, তবে জ্ঞান-বুদ্ধির দাবী এই যে, তোমরা মৃত্যু কামনা কর এবং মৃত্যুর জন্য আগ্রহান্বিত থাক।

এরপর কোরআন নিজেই বলে ঃ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ

অর্থাৎ তারা কখনও মৃত্যু কামনা করবে না। কারণ, তারা পরকালের জন্য কুফর, শিরক ও কুকর্ম ব্যতীত আর কিছুই পায়নি। অতএব তারা ভালরূপে জানে যে, পরকালে তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তিই অবধারিত রয়েছে। তারা আল্লাহ্‌র প্রিয়জন হওয়ার যে দাবী করে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এটা স্বয়ং তাদের অজানা নেই। তবে দুনিয়ার উপকারিতা লাভ করার জন্য তারা এ ধরনের দাবী করে। তারা আরও জানে যে, যদি রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র কথায় তারা মৃত্যু কামনা করে, তবে তা অবশ্যই কবূল হবে এবং তারা মরে যাবে। তাই বলা হয়েছে যে, ইহুদীরা মৃত্যু কামনা করতেই পারে না।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন ঃ যদি এক্ষণে তাদের কেউ মৃত্যু কামনা করত, তবে সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হত।—(রূহুল-মা'আনী)

মৃত্যু কামনা জায়েয কি না ঃ সূরা বাক্বারায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। হাদীসে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। এর প্রধান কারণ এই যে, দুনিয়াতে কারও এরূপ বিশ্বাস করার অধিকার নেই যে, সে মৃত্যুর পর অবশ্যই জান্নাতে যাবে এবং কোন প্রকার শাস্তির আশংকা নেই। এমতাবস্থায় মৃত্যু কামনা করা আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে নিজের বাহাদুরী প্রকাশ করারই নামান্তর।

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ —অর্থাৎ ইহুদীরা উপরোক্ত দাবী সত্ত্বেও মৃত্যু কামনা থেকে বিরত থাকত। এর সারমর্ম মৃত্যু থেকে পলায়ন করা বৈ নয়। অতএব আপনি তাদেরকে বলে দিন ঃ যে মৃত্যু থেকে তোমরা পলায়নপর, তা অবশ্যই আসবে। আজ নয় তো কিছুদিন পর। সুতরাং মৃত্যু থেকে পলায়ন সম্পূর্ণত কারও সাধ্যে নেই।

মৃত্যুর কারণাদি থেকে পলায়নের বিধান ঃ যেসব বিষয় স্বভাবত মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকে, সেগুলো থেকে পলায়ন জ্ঞান-বুদ্ধি ও শরীয়তের পরিপন্থী নয়। একবার রসূলুল্লাহ্‌ (সা) একটি কাত হয়ে পড়া প্রাচীরের নীচ দিয়ে যাওয়ার সময় দ্রুত চলে যান। কোথাও অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হলে সেখান থেকে পলায়ন না করা বিবেক ও শরীয়ত উভয়ের পরিপন্থী। কিন্তু আয়াতে যে মৃত্যু থেকে পলায়নের নিন্দা করা হয়েছে, এটা তার অন্তর্ভুক্ত নয়। যদি বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ থাকে এবং জানে যে, মৃত্যুর সময় এলে তা থেকে পলায়ন নিষ্ফল। যেহেতু তার জানা নেই যে, এই অগ্নি অথবা বিষ অথবা অন্য কোন মারাত্মক বস্তুর মধ্যে নির্দিষ্টভাবে তার মৃত্যু লিখিত আছে কি না, তাই এ থেকে পলায়ন মৃত্যু থেকে পলায়ন নয়, যার নিন্দা করা হয়েছে।

কোন জনপদে প্লেগ অথবা মহামারী দেখা দিলে সেখান থেকে পলায়ন করা জায়েয কিনা, এটা একটা স্বতন্ত্র মাস'আলা। ফিকহ্‌ ও হাদীসগ্রন্থে এর বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। তফসীরে রূহুল মা'আনীতে এই আয়াতের তফসীরেও এ সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তা উদ্ধৃত করার অবকাশ নেই।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ

ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ فَإِذَا
قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا
اللّٰهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا
إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ
التِّجَارَةِ ۚ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِينَ ۝

(৯) হে মু'মিনগণ ! জুমু'আর দিনে যখন নামাযের আযান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্‌র স্মরণের পানে ত্বরা কর এবং বেচাকেনা বন্ধ কর। এটা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ। (১০) অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ তালাশ কর ও আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও। (১১) তারা যখন কোন ব্যবসায়ের সুযোগ অথবা ক্রীড়াকৌতুক দেখে তখন আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে তারা সেদিকে ছুটে যায়। বলুনঃ আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে, তা ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যবসায় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আল্লাহ্ সর্বোত্তম রিযিকদাতা।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মু'মিনগণ, জুমু'আর দিনে যখন (জুমু'আর) নামাযের জন্য আযান দেওয়া হয় তখন তোমরা আল্লাহ্‌র স্মরণের (অর্থাৎ নামায ও খোতবার) পানে ত্বরা করে চল এবং বেচাকেনা (এমনিভাবে প্রতিবন্ধক কর্মব্যস্ততা) বন্ধ কর। (অধিক গুরুত্বদানের জন্য বিশেষভাবে বেচাকেনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, বেচাকেনা বর্জন করাকে উপকার বর্জন করা মনে করা হয়)। এটা (অর্থাৎ বেচাকেনা ও কর্মব্যস্ততা ত্যাগ করে নামাযের দিকে ত্বরা করা) তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ। (কেননা, এর উপকারিতা চিরস্থায়ী এবং বেচাকেনা ইত্যাদির উপকারিতা ক্ষণস্থায়ী)। অতঃপর (জুমু'আর) নামায সমাপ্ত হয়ে গেলে (ইসলামের প্রথমদিকে খোতবা পরে পাঠ করা হত। এমতাবস্থায় নামায সমাপ্ত হওয়ার অর্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিসহ সমাপ্ত হওয়া অর্থাৎ নামায ও খোতবা উভয়ই সমাপ্ত হওয়া, তখন তোমাদের জন্য অনুমতি আছে যে) তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ তালাশ কর (অর্থাৎ তখন পার্থিব কাজকর্মের জন্য হাটে-বাজারে ছড়িয়ে পড়ার অনুমতি আছে) এবং (এ সময়েও) আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ কর (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আদেশ ও জরুরী ইবাদত থেকে গাফিল হয়ে পার্থিব কাজকর্মে মশগুল হয়ো না) যাতে তোমরা সফলকাম হও। (কারও কারও অবস্থা এই যে) তারা যখন কোন ব্যবসায়ের সুযোগ অথবা ক্রীড়া-কৌতুক দেখে, তখন আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে তৎপ্রতি ছুটে যায়। বলুনঃ আল্লাহ্‌র কাছে যা (অর্থাৎ

সওয়াব ও নৈকট্য) আছে, তা ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যবসায় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট (যদি তা থেকে রিযিক বৃদ্ধির লালসা থাকে, তবে বুঝে নাও যে) আল্লাহ্ সর্বোত্তম রিযিকদাতা। (তাঁর জরুরী ইবাদতে মশগুল থাকলে তিনি নির্ধারিত রিযিক দান করেন। এমতাবস্থায় তাঁর আদেশ কেন বর্জন করা হবে ?)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا

يوم الجمعة—এই দিনটি মুসলমানদের সমাবেশের দিন। তাই এই দিনকে 'ইয়াওমুল জুমু'আ' বলা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও সমস্ত জগতকে ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। এই ছয়দিনের শেষ দিন ছিল জুমু'আর দিন। এই দিনেই আদম (আ) সৃজিত হন, এই দিনেই তাঁকে জান্নাতে দাখিল করা হয় এবং এই দিনেই জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নামানো হয়। কিয়ামত এই দিনেই সংঘটিত হবে। এই দিনে এমন একটি মুহূর্ত আসে, যাতে মানুষ যে দোয়াই করে, তাই কবুল হয়। এসব বিষয় সহীহ্ হাদীসে প্রমাণিত রয়েছে।---(ইবনে কাসীর)

আল্লাহ্ তা'আলা প্রতি সপ্তাহে মানবজাতির সমাবেশ ও ঈদের জন্য এই দিন রেখে-ছিলেন। কিন্তু পূর্ববর্তী উম্মতরা তা পালন করতে ব্যর্থ হয়। ইহুদীরা 'ইয়াওমুস সাব্ত' তথা শনিবারকে নিজেদের সমাবেশের দিন নির্ধারিত করে নেয় এবং খৃস্টানরা রবিবারকে। আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতকেই তওফীক দিয়েছেন যে, তারা শুক্রবারকে মনোনীত করেছে। —(ইবনে কাসীর) মূর্খতা যুগে শুক্রবারকে 'ইয়াওমে আরূবা' বলা হত। আরবে কা'ব ইবনে লুঈ সর্বপ্রথম এর নাম 'ইয়াওমুল জুমু'আ' রাখেন। এই দিনে কোরায়েশদের সমাবেশ হত এবং কা'ব ইবনে লুঈ ভাষণ দিতেন। এটা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আবির্ভাবের পাঁচশ ষাট বছর পূর্বের ঘটনা।

কা'ব ইবনে লুঈ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পূর্বপুরুষদের অন্যতম। আল্লাহ্ তা'আলা মূর্খতা যুগেও তাকে প্রতিমা পূজা থেকে রক্ষা করেন এবং একত্ববাদের তওফীক দান করেন। তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আবির্ভাবের সুসংবাদও মানুষকে শুনিয়েছিলেন। কোরায়েশ গোত্র তাঁকে একজন মহান ব্যক্তি হিসাবে সম্মান করত। ফলে রসূলুল্লাহ্ (সা) নবুয়ত লাভের পাঁচশ ষাট বছর পূর্বে যেদিন তার মৃত্যু হয়, সেদিন থেকেই কোরায়েশরা তাদের বছর গণনা শুরু করে। শুরুতে কা'বা গৃহের ভিত্তি স্থাপন থেকে আরবদের বছর গণনা আরম্ভ করা হত। কা'ব ইবনে লুঈ-এর মৃত্যুর পর তার মৃত্যুদিবস থেকেই বছর গণনা প্রচলিত হয়ে যায়। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্মের বছর যখন হস্তিবাহিনীর ঘটনা সংঘটিত হয়, তখন এদিন থেকেই তারিখ গণনা আরম্ভ হয়। সারকথা এই যে, ইসলাম পূর্বকালেও কা'ব ইবনে

নুঈ-এর আমলে শুক্রবার দিনকে গুরুত্ব দান করা হত। তিনিই এই দিনের নাম জুমু'আর দিন রেখেছিলেন।—(মাযহারী)

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে মদীনার আনসারগণ হিজরত ও জুমু'আর নামায ফরয হওয়ার পূর্বেই স্বকীয় মতামতের মাধ্যমে জুমু'আর দিনে সমাবেশ ও ইবাদতের ব্যবস্থা করত।—(মাযহারী)

نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ—نداء صلوة বলে আযান বোঝানো হয়েছে। سعى শব্দের এক অর্থ দৌড়া এবং অপর অর্থ কোন কাজ গুরুত্ব সহকারে করা। এখানে এই অর্থই উদ্দেশ্য। কারণ, নামাযের জন্য দৌড়ে আসতে রসূলুল্লাহ্ (সা) নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ শান্তি ও গাম্ভীর্য সহকারে নামাযের জন্য গমন কর। আয়াতের অর্থ এই যে, জুমু'আর দিনে জুমু'আর আযান দেওয়া হলে আল্লাহ্র রিযিকের দিকে ত্বরা কর। অর্থাৎ নামায ও খোতবার জন্য মসজিদে যেতে যত্নবান হও। যে ব্যক্তি দৌড় দেয়, সে অন্য কোন কাজের প্রতি মনোযোগ দেয় না, তোমরাও তেমনি আযানের পর নামায ও খোতবা ব্যতীত অন্য কাজের দিকে মনোযোগ দিও না।—(ইবনে কাসীর) ذكر الله বলে জুমু'আর নামায এবং এই নামাযের অন্যতম শর্ত খোতবাও বোঝানো হয়েছে।—(মাযহারী)

وَذَرُوا الْبَيْعَ—অর্থাৎ বেচাকেনা ছেড়ে দাও। এতে বোঝা যায় যে, জুমু'আর আযানের পর বেচাকেনা হারাম করা হয়েছে। এই আদেশ পালন করা বিক্রেতা ও ক্রেতা সবার উপর ফরয। বলা বাহুল্য, দোকানপাট বন্ধ করে দিলেই ক্রয়-বিক্রয় আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যাবে।

জ্ঞাতব্যঃ জুমু'আর আযানের পর কৃষিকাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শ্রমসহ সকল কর্মব্যস্ততা নিষিদ্ধ করাই উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু কোরআন পাক কেবল বেচাকেনার কথা উল্লেখ করেছেন। এতে ইঙ্গিত হতে পারে যে, ছোট ও বড় শহরের অধিবাসীদেরকে জুমু'আর নামায পড়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। ছোট ছোট গ্রাম ও অনাবাদ জায়গায় জুমু'আ হবে না। তাই শহরবাসীদের সাধারণ কর্মব্যস্ততা ও বেচাকেনাই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফিকহ্বিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, আয়াতে বেচাকেনা বলে এমন প্রত্যেক কাজ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা জুমু'আর নামাযে গমনে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। অতএব আযানের পর পানাহার করা, নিদ্রা যাওয়া, কারও সাথে কথা বলা, অধ্যয়ন করা ইত্যাদি সব নিষিদ্ধ। কেবল জুমু'আর প্রস্তুতি সম্পর্কিত কাজকর্ম করা যেতে পারে।

শুরুতে জুমু'আর আযান একটি ছিল, যা খোতবার পূর্বে ইমামের সামনে দাঁড়িয়ে দেওয়া হত। দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রা)-এর আমল পর্যন্ত এই পদ্ধতিই প্রচলিত ছিল। হযরত ওসমান (রা)-এর আমলে যখন মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে গেল এবং মদীনার চতুষ্পার্শ্বে ছড়িয়ে পড়ল তখন সেই আযান দূর পর্যন্ত শুনা যেত না। তখন হযরত ওসমান

(রা) মসজিদের বাইরে নিজ বাসগৃহ যাওয়ায় আরও একটি আযানের ব্যবস্থা করলেন। এই আযান সমগ্র মদীনা শহরে শুনা যেত। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কেউ এই নতুন ব্যবস্থায় আপত্তি করেন নি। ফলে এই প্রথম আযান সাহাবায়ে কিরামের ইজমা দ্বারা সিদ্ধ হয়ে গেল। আযানের পর বেচাকেনা ও অন্যান্য কর্মব্যস্ততা নিষিদ্ধ হওয়ার যে আদেশ খোতবার আযানের পর কার্যকর ছিল, তা এখন থেকে প্রথম আযানের পরই কার্যকর হয়ে গেল। হাদীস, তফসীর ও ফিকহ্‌র কিতাবাদিতে এসব বিষয় কোন প্রকার মতবিরোধ ছাড়াই বর্ণিত আছে।

সমগ্র উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে, জুমু'আর দিন যোহরের পরিবর্তে জুমু'আর নামায ফরয। তারা এ ব্যাপারেও একমত যে, জুমু'আর নামায সাধারণত পাঞ্জেগানা নামাযের মত নয়, এর জন্য কিছু অতিরিক্ত শর্ত রয়েছে। পাঞ্জেগানা নামায একাকী জমা'আত ছাড়াও পড়া যায় এবং দুইজনেও পড়া যায়, কিন্তু জুমু'আর নামায জামা'আত ব্যতীত আদায় হয় না। জামা'আতের সংখ্যায় ফিকহ্‌বিদগণের বিভিন্ন উক্তি আছে। এমনিভাবে পাঞ্জেগানা নামায নদী, পাহাড়, জঙ্গল সর্বত্র আদায় হয়, কিন্তু জুমু'আর নামায এসব জায়গায় কারও মতে আদায় হয় না। নারী, রোগী ও মুসাফিরের উপর জুমু'আর নামায ফরয নয়। তারা জুমু'আর পরিবর্তে যোহর পড়বে। কি ধরনের জনপদে জুমু'আ ফরয, এ সম্পর্কে ইমামগণের বিভিন্ন উক্তি আছে। ইমাম শাফেয়ী (র)-র মতে যে জনপদে চল্লিশ জন মুক্ত, বুদ্ধিমান ও প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষ বাস করে, সেখানে জুমু'আ হতে পারে। এর কম হলে জুমু'আ হবে না। ইমাম মালেক (র)-এর মতে জুমু'আর জন্য এমন জনপদ জরুরী, যার গৃহ সংলগ্ন এবং যাতে বাজারও আছে। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-র মতে জুমু'আর জন্য ছোট বড় শহর অথবা বড় গ্রাম হওয়া শর্ত, যাতে অলিগলি ও বাজার আছে এবং পারস্পরিক ব্যাপারাদি মীমাংসা করার জন্য কোন বিচারক আছে।

সারকথা এই যে, উপরোক্ত আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে উম্মতের অধিকাংশ আলিম একমত যে, সর্বাবস্থায় প্রত্যেক মুসলমানের উপর জুমু'আ ফরয নয়; বরং সবার মতে কিছু কিছু শর্ত আছে। শর্তগুলো কি কি, কেবল সে ব্যাপারেই মতবিরোধ আছে। তবে যাদের উপর ফরয, তাদের উপর গুরুত্ব ও তাকীদ সহকারেই ফরয। তাদের মধ্যে কেউ শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতিরেকে জুমু'আ ছেড়ে দিলে তার জন্য সহীহ্ হাদীসসমূহে কঠোর শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা শর্তাদি সহকারে জুমু'আর নামায আদায় করে, তাদের জন্য বিশেষ ফযীলত ও বরকতের ওয়াদা আছে।

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ পূর্বের

আয়াতসমূহে জুমু'আর আযানের পর বেচাকেনা ইত্যাদি পার্থিব কাজকর্ম নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এই আয়াতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে যে, জুমু'আর নামায সমাপ্ত হলে ব্যবসায়িক কাজকর্ম এবং রিযিক হাসিলের চেষ্টা সবাই করতে পারে।

জুমু'আর পরে ব্যবসায়ে বরকত ঃ হযরত এরাফ ইবনে মালেক (র) যখন জুমু'আর নামাযান্তে বাইরে আসতেন তখন মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَجَبْتُ دَعْوَتَکَ وَصَلَّیْتُ فَرِیْضَتَکَ وَانْتَشَرْتُ کَمَا اَمَرْتَنِیْ فَارْزُقْنِیْ مِنْ فَضْلِکَ وَاَنْتَ خَیْرُ الرّٰزِقِیْنَ -

হে আল্লাহ্! আমি তোমার ডাকে সাড়া দিয়েছি, তোমার ফরয নামায পড়েছি এবং তোমার আদেশ মত নামাযান্তে বাইরে যাচ্ছি। অতএব তুমি স্বীয় কৃপায় আমাকে রিযিক দান কর। তুমি উত্তম রিযিকদাতা।---(ইবনে কাসীর)

কোন কোন পূর্ববর্তী মনীষী থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি জুমু'আর পরে ব্যবসায়িক কাজ-কারবার করে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য সত্তরবার বরকত নাযিল করেন। —(ইবনে কাসীর)

وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا نِ انْفَضُّوْا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ০

এই আয়াতে তাদেরকে ছঁশিয়ার করা হয়েছে, যারা জুমু'আর খোতবা ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায়িক কাজ-কারবারে মনোযোগ দিয়েছিল। ইবনে কাসীর বলেন ঃ এই ঘটনা তখনকার, যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) জুমু'আর নামাযের পর জুমু'আর খোতবা পাঠ করতেন। দুই ঈদের নামাযে অদ্যাবধি এই নিয়ম প্রচলিত আছে। এক জুমু'আর দিনে রসূলুল্লাহ্ (সা) নামাযান্তে খোতবা দিচ্ছিলেন এমন সময় একটি বাণিজ্যিক কাফেলা মদীনার বাজারে উপস্থিত হয় এবং ঢোল ইত্যাদি পিটিয়ে তা ঘোষণা করা হয়। ফলে অনেক মুসল্লী খোতবা ছেড়ে বাজারে চলে যায় এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) স্বল্পসংখ্যক সাহাবীসহ মসজিদে থেকে যান। তাদের সংখ্যা বারজন বর্ণিত আছে।---(আবূ দাউদ) কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বললেন ঃ যদি তোমরা সবাই চলে যেতে, তবে মদীনার উপত্যকা আযাবের অগ্নিতে পূর্ণ হয়ে যেত---(ইবনে কাসীর)

তফসীরবিদ মুকাতিল বর্ণনা করেন, এই বাণিজ্যিক কাফেলাটি ছিল দেহ্ইয়া ইবনে খলফ্ কলবীর। সে সিরিয়া থেকে মাল-সম্ভার নিয়ে এসেছিল। তার কাফেলায় সাধারণত নিত্যপ্রয়োজনীয় সবকিছু থাকত। তার আগমনের সংবাদ পেলে মদীনার নারী-পুরুষ সবাই দৌড়ে কাফেলার কাছে যেত। দেহ্ইয়া ইবনে খলফ্ তখন পর্যন্ত মুসলমান ছিল না; পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

হাসান বসরী ও আবূ মালেক (র) বলেন ঃ এই কাফেলার আগমনের সময় মদীনায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য ছিল।—(মাযহারী) এসব কারণেই বিপুলসংখ্যক সাহাবায়ে কিরাম বাণিজ্যিক কাফেলার আওয়ায শুনে মসজিদ থেকে বের হয়ে যান। ফরয নামায শেষ হয়ে গিয়েছিল। খোতবা সম্পর্কে তাঁদের জানা ছিল না যে, এটাও ফরয। দ্বিতীয়ত

প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অগ্নিমূল্য এবং তৃতীয়ত বাণিজ্যিক কাফেলার উপর সবার ঝাঁপিয়ে পড়া---এসব কারণে তাঁরা মনে করেছিলেন যে, দেরীতে গেলে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যাবে না।

এসব কারণেই সাহাবায়ে কিরামের পদস্খলন হয় এবং উল্লিখিত হাদীসে তাঁদের প্রতি শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়। এ ব্যাপারে তাঁদেরকে লজ্জা দেওয়া ও হুঁশিয়ার করার জন্য আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই ঘটনার কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা) নিয়ম পরিবর্তন করে জুমু'আর নামাযের পূর্বে খোতবা দেওয়া শুরু করেন। বর্তমানে তাই সুন্নত।--(ইবনে কাসীর)

আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে একথা বলে দিতে আদেশ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র কাছে যে সওয়াব আছে, তা এই বাণিজ্য থেকে উত্তম। এটাও অবান্তর নয় যে, যারা নামায ও খোতবার খাতিরে ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দেয়, তাদের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দুনিয়াতেও বিশেষ বরকত নাযিল হবে, যেমন পূর্বে এমনি এক রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে।

سورة المنافقون

সূরা মুনাফিকুন

মদীনায় অবতীর্ণ, ১১ আয়াত, ২ রুকূ'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۘ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ
لَرَسُوْلُهٗ ۘ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ۝١ اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ
جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝٢
ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ۝٣ وَإِذَا
رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ ۭ وَإِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۭ كَاَنَّهُمْ
خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ۭ يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۭ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۭ
قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۚ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ۝٤ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ
رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَرَاَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ۝٥
سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۭ لَنْ يَّغْفِرَ
اللّٰهُ لَهُمْ ۭ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝٦ هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ
لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا ۭ وَلِلّٰهِ خَزَآئِنُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ۝٧ يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ
رَّجَعْنَآ إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ۭ وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ
وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٨

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) মুনাফিকরা আপনার কাছে এসে বলে ঃ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রসূল। আল্লাহ্ জানেন যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহ্‌র রসূল এবং আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। (২) তারা তাদের শপথসমূহকে ঢালরূপে ব্যবহার করে। অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র পথে বাধা সৃষ্টি করে। তারা যা করছে, তা খুবই মন্দ। (৩) এটা এ জন্য যে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করার পর পুনরায় কাফির হয়েছে। ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয়েছে। অতএব তারা বুঝে না। (৪) আপনি যখন তাদেরকে দেখেন, তখন তাদের দেহাবয়ব আপনার কাছে প্রীতিকর মনে হয়। আর যদি তারা কথা বলে, তবে আপনি তাদের কথা শুনেন। তারা প্রাচীরে ঠেকানো কাঠসদৃশ। প্রত্যেক শোরগোলকে তারা নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে। তারাই শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হোন। ধ্বংস করুন আল্লাহ্ তাদেরকে। তারা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছে? (৫) যখন তাদেরকে বলা হয় ঃ তোমরা এস, আল্লাহ্‌র রসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা ঘুরিয়ে নেয় এবং আপনি তাদেরকে দেখেন যে, তারা অহংকার করে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৬) আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা না করুন, উভয়ই সমান। আল্লাহ্ কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না। (৭) তারাই বলে ঃ আল্লাহ্‌র রসূলের সাহচর্যে যারা আছে, তাদের জন্য ব্যয় করো না; পরিণামে তারা আপনা আপনি সরে যাবে। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ধন-ভাণ্ডার আল্লাহ্‌রই, কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝে না। (৮) তারা বলে ঃ আমরা যদি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি, তবে সেখান থেকে সবল অবশ্যই দুর্বলকে বহিষ্কৃত করবে। শক্তি তো আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও মু'মিনদেরই, কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন মুনাফিকরা আপনার কাছে আসে, তখন বলে ঃ আমরা (মনেপ্রাণে) সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূল (সা)। আল্লাহ্ তো জানেন যে, আপনি অবশ্যই তাঁর রসূল। (এ ব্যাপারে তাদের উক্তিকে মিথ্যা বলা যায় না) এবং (এতদসত্ত্বেও) আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা (এ কথায়) অবশ্যই মিথ্যাবাদী (যে, তারা মনেপ্রাণে সাক্ষ্য দিচ্ছে। কারণ, তাদের এই সাক্ষ্য নিছক মৌখিক---আন্তরিক নয়)। তারা তাদের শপথসমূহকে (জান ও মাল বাঁচানোর জন্য) ঢালরূপে ব্যবহার করে। (কেননা, কুফর প্রকাশ করলে তাদের অবস্থাও অন্যান্য কাফিরের মত হত---তারাও জিহাদের সম্মুখীন হত, নিহত ও লুণ্ঠিত হত)। অতঃপর (এই অনিষ্টের সাথে এ কটি সংক্রামক অনিষ্টও রয়েছে। তা এই যে) তারা (অপরকেও) আল্লাহ্‌র পথ থেকে নিবৃত্ত করে। তারা যা করছে, তা খুবই মন্দ। এটা (অর্থাৎ তাদের কর্ম খুবই মন্দ বললাম) এজন্য যে, তারা (প্রথমে বাহ্যত) বিশ্বাস করেছে, অতঃপর (তাদের শয়তানদের কাছে যেয়ে إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ---এই কুফরী বাক্য বলে) কাফির হয়ে গেছে। (উদ্দেশ্য এই যে, তাদের কপটতার কারণে

তাদের কর্মকে মন্দ বলা হয়েছে। কারণ, কপটতা জঘন্যতম কুফর)। ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয়েছে। অতএব তারা (সত্য বিষয়) বুঝে না। (তারা বাহ্যত এমন চটপটে যে,) আপনি তাদেরকে দেখলে (বাহ্যিক শান-শওকতের কারণে) তাদের দেহাবয়ব আপনার কাছে প্রীতিকর মনে হবে আর (কথায় এমন যে) যদি কথা বলে, তবে আপনি তাদের কথা (প্রাঞ্জল ও মিষ্টি হওয়ার কারণে) শুনেন, (কিন্তু যেহেতু অন্তঃসারশূন্য, তাই বাহ্যিক অঙ্গসৌষ্ঠবের সাথে অভ্যন্তরীণ গুণাবলী থেকে মুক্ত হওয়ার কারণে তাদের দৃষ্টান্ত এই যে) তারা প্রাচীরে ঠেকানো কাঠসদৃশ। (এই কাঠ দৈর্ঘ্য প্রস্থে বিশাল বপু, কিন্তু নিষ্প্রাণ। সাধারণ রীতি এই যে, যে কাঠ আপাতত কাজে লাগে না, তা দেয়ালে ঠেকিয়ে রেখে দেওয়া হয়। এরূপ কাঠ মোটেই উপকারী নয়। এমনিভাবে মুনাফিকরা দেখতে বেশ শানদার, কিন্তু ভেতর থেকে সম্পূর্ণ বেকার। ঈমান ও আন্তরিকতার অভাব হেতু তারা সর্বদা এই আশংকায় থাকে যে, মুসলমানরা কোন সময় আভাসে-ইঙ্গিতে অথবা ওহীর মাধ্যমে তাদের অবস্থা জেনে ফেলবে এবং অন্যান্য কাফিরের ন্যায় তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধাভিযান পরিচালিত হবে। এই ধারণায় তারা এতটুকু শংকিত থাকে যে,) প্রত্যেক শোরগোলকে (তা যে কারণেই হোক) তারা নিজেদের বিরুদ্ধেই মনে করতে থাকে। (প্রকৃতপক্ষে) তারাই (তোমাদের প্রকৃত) শত্রু। অতএব আপনি তাদের সম্পর্কে সতর্ক হোন। (অর্থাৎ তাদের কোন কথায় আস্থা স্থাপন করবেন না)। ধ্বংস করুন আল্লাহ্ তাদেরকে। তারা (সত্য ধর্ম থেকে) কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছে? (অর্থাৎ রোজই দূরে সরে যাচ্ছে)। এবং (তাদের অহংকার ও দুষ্টুমির অবস্থা এই যে) যখন তাদেরকে বলা হয়ঃ [রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে] এসো, আল্লাহ্র রসূল (সা) তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা ঘুরিয়ে নেয় এবং আপনি তাদেরকে দেখেন যে, তারা দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (তাদের কুফরের যখন এই অবস্থা, তখন) আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা না করুন, উভয়ই সমান। আল্লাহ্ কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। (উদ্দেশ্য এই যে, তারা যদি আপনার কাছে আসতও এবং আপনি তাদের বাহ্যিক অবস্থাদৃষ্টে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনাও করতেন, তবুও তাদের কোন উপকার হত না। তাদের ভবিষ্যৎ অবস্থা এই যে) আল্লাহ্ তা'আলা এহেন পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। তারাই বলেঃ যারা আল্লাহ্র রসূল (সা)-এর সাহচর্যে আছে, তাদের জন্য কিছুই ব্যয় করো না। পরিণামে তারা আপনা-আপনি সরে যাবে। (তাদের এই উক্তি নিরেট মূর্খতা; কেননা) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ধন-ভাণ্ডার আল্লাহ্ তা'আলারই কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝে না। (তারা শহরবাসীদের দান-খয়রাতকেই রিযিকের একমাত্র পথ মনে করে)। তারা বলেঃ আমরা যদি এখন মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি, তবে সেখান থেকে সবল অবশ্যই দুর্বলকে বহিষ্কৃত করবে। (অর্থাৎ আমরা সেই প্রবাসী লোকদেরকে বহিষ্কার করব। এটা তাদের নির্বুদ্ধিতা যে, তারা নিজেদেরকে সবল এবং মুসলমানদেরকে দুর্বল মনে করে; বরং) শক্তি তো আল্লাহ্র (সরাসরিভাবে) তাঁর রসূল (সা)-এর (আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে) এবং মু'মিনদেরই (আল্লাহ্ ও রসূলের সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে)। কিন্তু মুনাফিকরা জানে না। (তারা ধ্বংসশীল বিষয়সমূহকে শক্তির উৎস মনে করে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা মুনাফিকুন অবতরণের বিস্তারিত ঘটনা ঃ এই ঘটনা মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ষষ্ঠ হিজরীতে এবং কাতাদাহ ও ওরওয়া (র)-র রেওয়ায়েত অনুযায়ী পঞ্চম হিজরীতে 'বনিল-মুস্তালিক' যুদ্ধের সময় সংঘটিত হয়।---(মাযহারী) ঘটনা এই ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) সংবাদ পান যে, 'মুস্তালিক' গোত্রের সরদার হারেস ইবনে যেরার তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই হারেস ইবনে যেরার হযরত জুয়ায়রিয়া (রা)-র পিতা, যিনি পরে ইসলাম গ্রহণ করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিবিদের অন্তর্ভুক্ত হন। হারেস ইবনে যেরারও পরে মুসলমান হয়ে যায়।

সংবাদ পেয়ে রসূলে করীম (সা) একদল মুজাহিদসহ তাদের মুকাবিলা করার জন্য বের হন। এই জিহাদে গমনকারী মুসলমানদের সঙ্গে অনেক মুনাফিকও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশীদার হওয়ার লোভে রওয়ানা হয়। কারণ, তারা অন্তরে কাফির হলেও বিশ্বাস করত যে, আল্লাহ্র সাহায্যে তিনি এই যুদ্ধে বিজয়ী হবেন।

রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মুস্তালিক গোত্রে পৌঁছুলেন, তখন 'মুরাইসী' নামে খ্যাত একটি কূপের কাছে হারেস ইবনে যেরারের বাহিনীর সম্মুখীন হলেন। এ কারণেই এই যুদ্ধকে মুরাইসী যুদ্ধও বলা হয়। উভয় পক্ষ সারিবদ্ধ হয়ে তীর বর্ষণের মাধ্যমে মুকাবিলা হল। মুস্তালিক গোত্রের বহু লোক হতাহত হল এবং অবশিষ্টরা পলায়ন করতে লাগল। আল্লাহ্ তা'আলা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বিজয় দান করলেন। প্রতিপক্ষের কিছু ধনসম্পদ এবং কয়েকজন পুরুষ ও নারী মুসলমানদের হাতে বন্দী হল। এভাবে এই জিহাদের সমাপ্তি ঘটল।

দেশ ও বংশগত জাতীয়তার ভিত্তিতে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা কুফর ও মূর্খতা যুগের শ্লোগান ঃ কিন্তু এরপর যখন মুসলমান মুজাহিদ বাহিনী মুরাইসী কূপের কাছে সমবেত ছিল, তখন একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেল। একজন মুহাজির ও একজন আনসারীর মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়ে হাতাহাতির সীমা অতিক্রম করে পারস্পরিক যুদ্ধের পর্যায়ে পৌঁছে গেল। মুহাজির ব্যক্তি সাহায্যের জন্য মুহাজিরগণকে এবং আনসারী ব্যক্তি আনসার সম্প্রদায়কে ডাক দিল। উভয়ের সাহায্যার্থে কিছু লোক তৎপরও হয়ে উঠল। এভাবে ব্যাপারটি মুসলমানদের পারস্পরিক সংঘর্ষের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। রসূলুল্লাহ্ (সা) সংবাদ পেয়ে অনতিবিলম্বে অকুস্থলে পৌঁছে গেলেন এবং ভীষণ রুষ্ট হয়ে বললেন ঃ مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ — অর্থাৎ এ কি মূর্খতা যুগের আহবান ! দেশ ও বংশগত জাতীয়তাকে ভিত্তি করে সাহায্য ও প্রতিরক্ষার কারবার হচ্ছে কেন? তিনি আরও বললেন ঃ دَعُوهَا فَاِنَّهَا مُنْتِنَةٌ এই শ্লোগান বন্ধ কর। এটা দুর্গন্ধময় শ্লোগান। তিনি বললেন ঃ প্রত্যেক মুসলমানের উচিত অপর মুসলমানদের সাহায্য করা—সে জালিম হোক অথবা মজলুম। মজলুমকে সাহায্য করার অর্থ তো জানাই যে, তাকে জুলুম থেকে রক্ষা করা। জালিমকে সাহায্য করার অর্থ তাকে জুলুম থেকে নিবৃত্ত করা। এটাই তার প্রকৃত সাহায্য। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক ব্যাপারে দেখা উচিত কে জালিম ও কে মজলুম।

এরপর মুহাজির, আনসারী, গোত্র ও বংশ নির্বিশেষে প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য মজলুমকে জুলুম থেকে রক্ষা করা এবং জালিমের হাত চেপে ধরা---সে আপন সহোদর ভাই হোক অথবা পিতা হোক। এই দেশ ও বংশগত জাতীয়তা একটা মূর্খতাসুলভ দুর্গন্ধময় স্লোগান। এর ফল জঞ্জাল বাড়ানো ছাড়া কিছুই হয় না।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এই বক্তৃতা শোনামাত্রই ঝগড়া মিটে গেল। এ ব্যাপারে মুহাজির জাহ্জাহের বাড়াবাড়ি প্রমাণিত হল। তার মুকাবিলায় সিনান ইবনে ওবরা আনসারী (রা) আহত হয়েছিলেন। হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা) তাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে মাফ করিয়ে নিলেন। ফলে ঝগড়াকারী জালিম ও মজলুম উভয়ই পুনরায় ভাই ভাই হয়ে গেল।

মুনাফিকদের যে দলটি যুদ্ধলব্ধ সম্পদের লালসায় মুসলমানদের সাথে আগমন করেছিল, তারা মনে মনে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলমানদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করত কিন্তু পার্থিব স্বার্থের খাতিরে নিজেদেরকে মুসলমান জাহির করত। তাদের নেতা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই যখন মুহাজির ও আনসারীর পারস্পরিক সংঘর্ষের খবর পেল, তখন সে একে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার একটি সুবর্ণ সুযোগ মনে করে নিল। সে মুনাফিকদের এক মজলিসে, যাতে মু'মিনদের মধ্যে কেবল যায়েদ ইবনে আরকাম উপস্থিত ছিলেন, আনসারকে মুহাজিরগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে বলল ঃ তোমরা মুহাজিরদেরকে দেশে ডেকে এনে মাথা চড়িয়েছ, নিজেদের ধনসম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি তাদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছ। তারা তোমাদের রুটি খেয়ে লালিত হয়ে এখন তোমাদেরই ঘাড় মটকাচ্ছে। যদি তোমাদের এখনও জ্ঞান ফিরে না আসে, তবে পরিণামে এরা তোমাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলবে। কাজেই তোমরা ভবিষ্যতে টাকা পয়সা দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করো না। এতে তারা আপনা-আপনি ছত্রভঙ্গ হয়ে চলে যাবে। এখন তোমাদের কর্তব্য এই যে, মদীনায় ফিরে গিয়ে সবলরা দুর্বলদেরকে বহিষ্কার করে দেবে।

সবল বলে তার উদ্দেশ্য ছিল নিজের দল ও আনসার এবং দুর্বল বলে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুহাজির সাহাবায়ে কিরাম। হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) একথা শোনা মাত্রই বলে উঠলেন ঃ আল্লাহ্র কসম, তুই-ই দুর্বল, লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত। পক্ষান্তরে রসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তিবলে এবং মুসলমানদের ভালবাসার জোরে সফলকাম।

আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের ইচ্ছা ছিল যে বিপদ দেখলে সে তার কপটতার উপর পর্দা ফেলে দেবে। তাই সে স্পষ্ট ভাষা ব্যবহার করেনি। কিন্তু যায়েদ ইবনে আরকামের ক্রোধ দেখে তার সম্বিৎ ফিরে এল। পাছে তার কুফর প্রকাশ হয়ে পড়ে, এই আশংকায় সে হযরত যায়েদের কাছে ওযর পেশ করে বলল ঃ আমি তো এ কথাটি হাসির ছলে বলেছিলাম। আমার উদ্দেশ্য রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিরুদ্ধে কিছু করা ছিল না।

যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) মজলিস থেকে উঠে সোজা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে গেলেন এবং আদ্যোপান্ত ঘটনা তাঁকে বলে শোনালেন। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে সংবাদটি খুবই গুরুতর মনে হল। মুখমণ্ডলে পরিবর্তনের রেখা ফুটে উঠল। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) অল্প বয়স্ক সাহাবী ছিলেন। তিনি তাঁকে বললেন ঃ বৎস! দেখ, তুমি মিথ্যা বলছ না তো? যায়েদ কসম খেয়ে বললেন ঃ না, আমি নিজ কানে এসব কথা শুনেছি। রসূলুল্লাহ্

(সা) আবার বললেন ঃ তোমার কোনরূপ বিভ্রান্তি হয়নি তো? যায়েদ উত্তরে পূর্বের কথাই বললেন। এরপর মুনাফিক সরদারের এই কথা গোটা মুসলমান বাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে এ ছাড়া আর কোন আলোচনাই রইল না। এদিকে সব আনসার যায়েদ ইবনে আরকাম (রা)-কে তিরস্কার করতে লাগলেন যে, তুমি সম্প্রদায়ের নেতার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করেছ এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছ। যায়েদ (রা) বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, সমগ্র খাযরাজ গোত্রের মধ্যে আমার কাছে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই অপেক্ষা অধিক প্রিয় কেউ নেই। কিন্তু যখন সে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিরুদ্ধে এসব কথাবার্তা বলেছে, তখন আমি সহ্য করতে পারিনি। যদি আমার পিতাও এমন কথা বলত তবে আমি তাও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র গোচরীভূত করতাম।

অপরদিকে হযরত ওমর (রা) এসে আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে অনুমতি দিন আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিই। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে হযরত ওমর (রা) এ কথা বলেছিলেন ঃ আপনি ওব্বাদ ইবনে বিশরকে আদেশ করুন, সে তার মস্তক কেটে আপনার সামনে উপস্থিত করুক।

রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ ওমর, এর কি প্রতিকার যে, মানুষের মধ্যে খ্যাত হয়ে যাবে আমি আমার সাহাবীকে হত্যা করি। অতঃপর তিনি ইবনে উবাইকে হত্যা করতে বারণ করে দিলেন। হযরত ওমর (রা)-এর এই কথা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই-এর পুত্র জানতে পারলেন। তাঁর নামও আবদুল্লাহ্ ছিল। তিনি খাঁটি মুসলমান ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন ঃ যদি আপনি আমার পিতাকে এসব কথাবার্তার কারণে হত্যা করবার ইচ্ছা রাখেন, তবে আমাকে আদেশ করুন, আমি তার মস্তক কেটে আপনার কাছে এই মজলিস ত্যাগ করার পূর্বে হাযির করব। তিনি আরও আরয করলেন ঃ সমগ্র খাযরাজ গোত্র সাক্ষী, তাদের মধ্যে কেউ আমা অপেক্ষা অধিক পিতামাতার সেবা ও আনুগত্যকারী নেই। কিন্তু আল্লাহ্ ও রসূলের বিরুদ্ধে তাদেরও কোন বিষয় সহ্য করতে পারব না। আমার আশংকা যে, আপনি যদি অন্য কাউকে আমার পিতাকে হত্যা করার আদেশ দেন এবং সে তাকে হত্যা করে, তবে আমি আমার পিতৃ-হন্তাকে চোখের সামনে চলাফেরা করতে দেখে আত্মসম্মানবোধের বশবর্তী হয়ে হত্যা করে দিতে পারি। এটা আমার জন্য আযাবের কারণ হবে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তাকে হত্যা করার ইচ্ছা আমার নেই এবং আমি কাউকে এ বিষয়ে আদেশও করিনি।

এই ঘটনার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতে অসময়ের সফর শুরু করার কথা ঘোষণা করে দিলেন এবং নিজে 'কসওয়া' উষ্ট্রীর পিঠে সওয়ার হয়ে গেলেন। যখন সাহাবায়ে কিরাম রওয়ানা হয়ে গেলেন, তখন তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে ডেকে এনে বললেন ঃ তুমি কি বাস্তবিকই এরূপ কথা বলেছ? সে অনেক কসম খেয়ে বলল ঃ আমি কখনও এরূপ কথা বলিনি। এই বালক (যায়েদ ইবনে আরকাম) মিথ্যাবাদী। স্বগোত্রে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। তারা সবাই স্থির করল যে, সম্ভবত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) ভুল বুঝেছে। আসলে ইবনে উবাই একথা বলেনি।

মোটকথা, রসূলুল্লাহ্ (সা) ইবনে উবাইয়ের কসম ও ওযর কবুল করে নিলেন। এদিকে জনগণের মধ্যে যায়েদ ইবনে আরকাম (রা)-এর বিরুদ্ধে ক্রোধ ও তিরস্কার আরও তীব্র হয়ে গেল। তিনি এই অপমানের ভয়ে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে লাগলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা) সমগ্র মুজাহিদ বাহিনীসহ সারাদিন ও সারারাত সফর করলেন এবং পরের দিন সকালেও সফর অব্যাহত রাখলেন। অবশেষে যখন সূর্যকিরণ প্রখর হতে লাগল, তখন তিনি কাফেলাকে এক জায়গায় থামিয়ে দিলেন। পূর্ণ এক দিন এক রাত সফরের ফলে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত সাহাবায়ে কিরাম মনযিলে অবস্থানের সাথে সাথে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন।

রাবী (বর্ণনাকারী) বলেন ঃ সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতে তাৎক্ষণিক ও অসময়ে সফর করা এবং সুদীর্ঘকাল সফর অব্যাহত রাখার পেছনে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উদ্দেশ্য ছিল আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের ঘটনা থেকে উদ্ভূত জল্পনা-কল্পনা হতে মুজাহিদদের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নেওয়া, যাতে এ সম্পর্কিত চর্চার অবসান ঘটে।

এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা) পুনরায় সফর করলেন। ইতিমধ্যে ওবাদা ইবনে সামেত (রা) আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে উপদেশচ্ছলে বললেন ঃ তুই এক কাজ কর। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে অপরাধ স্বীকার করে নে। তিনি তোর জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। এতে তোর মুক্তি হয়ে যেতে পারে। ইবনে উবাই এই উপদেশ শুনে মাথা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল। হযরত ওবাদা (রা) তখনই বললেন ঃ আমার মনে হয়, তোর এই বিমুখতা সম্পর্কে অবশ্যই কোরআনের আয়াত নাযিল হবে।

এদিকে সফর চলাকালে যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) বারবার রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আসতেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এই মুনাফিক লোকটি আমাকে মিথ্যাবাদী বলে গোটা সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন করেছে। অতএব, আমার সত্যায়ন ও এই ব্যক্তির মিথ্যার মুখোশ উন্মোচন সম্পর্কে অবশ্যই কোরআন নাযিল হবে। হঠাৎ যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) দেখলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মধ্যে ওহী অবতরণকালীন লক্ষণাদি ফুটে উঠছে। তাঁর শ্বাস ফুলে উঠছে, কপাল ঘর্মাক্ত হয়ে যাচ্ছে এবং তাঁর উষ্ট্রী বোঝার ভারে নুয়ে পড়ছে। যায়েদ (রা) আশাবাদী হলেন যে, এখন এ সম্পর্কে কোন ওহী নাযিল হবে। অবশেষে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এই অবস্থা দূর হয়ে গেল। যায়েদ (রা) বলেন ঃ আমার সওয়ারী রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছ ঘেঁষে যাচ্ছিল। তিনি নিজের সওয়ারীর উপর থেকেই আমার কান ধরলেন এবং বললেন ঃ

يا غلام صدق الله حديثك ونزلت سورة المنافقين فى ابن ابى من اولها الى اخرها -

অর্থাৎ হে বালক, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার কথার সত্যায়ন করেছেন এবং সম্পূর্ণ সূরা মুনাফিকুন ইবনে উবাইয়ের ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

এই রেওয়ায়েত থেকে জানা গেল যে, সূরা মুনাফিকুন সফরের মধ্যেই নাযিল হয়েছে। কিন্তু বগভী (র)-র রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় পৌঁছে যান এবং

যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) অপমানের ভয়ে গৃহে আত্মগোপন করেন, তখন এই সূরা নাযিল হয়েছে।

এক রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনার নিকটবর্তী আক্বীক উপত্যকায় পৌঁছেন, তখন ইবনে উবাইয়ের মু'মিন পুত্র আবদুল্লাহ্ (রা) সম্মুখে অগ্রসর হন এবং খুঁজতে খুঁজতে পিতা ইবনে উবাইয়ের কাছে পৌঁছে তার উষ্ট্রীকে বসিয়ে দেন। তিনি উষ্ট্রীর হাঁটুতে পা রেখে পিতাকে বললেনঃ আল্লাহ্র কসম, তুমি মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না, যে পর্যন্ত 'সবল দুর্বলকে বহিষ্কৃত করবে'---এ কথার ব্যাখ্যা না কর। এই বাক্যে 'সবল' কে?---রসূলুল্লাহ্ (সা), না তুমি? পুত্র পিতার পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছিল এবং যারা এ পথ অতিক্রম করছিল তারা পুত্র আবদুল্লাহ্কে তিরস্কার করছিল যে, পিতার সাথে এমন দুর্ব্যবহার করছ কেন? অবশেষে যখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উষ্ট্রী তাদের কাছে আসল, তখন তিনি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করলেন। লোকেরা বলল ঃ আবদুল্লাহ্ এই বলে তার পিতার পথ রুদ্ধ করে রেখেছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত তুমি মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না। রসূলুল্লাহ্ (সা) দেখলেন যে, মুনাফিক ইবনে উবাই বেগতিক হয়ে পুত্রের কাছে বলে যাচ্ছে ঃ আমি তো ছেলেপিলে ও নারীদের চাইতেও অধিক লাঞ্ছিত। একথা শুনে রসূলুল্লাহ্ (সা) পুত্রকে বললেনঃ তার পথ ছেড়ে দাও, তাকে মদীনায় যেতে দাও।

সূরা মুনাফিকুন অবতরণের পটভূমি এতটুকুই। এই কাহিনীর শুরুতে সংক্ষেপে একথাও বলা হয়েছে যে, বনিল-মুস্তালিক যুদ্ধের জন্য আসলে উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুয়ায়রিয়া (রা)-র পিতা হারেস ইবনে যেরার দায়ী ছিলেন। পরবর্তীকালে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জুয়ায়রিয়া (রা)-কে ইসলাম গ্রহণ এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পত্নী হওয়ার গৌরব দান করেন। তাঁর পিতা হারেসও পরে মুসলমান হয়ে যান।

এ ঘটনা মসনদে আহমদ, আবূ দাউদ ইত্যাদি কিতাবে এভাবে বর্ণিত আছে যে, মুস্তালিক গোত্র পরাজিত হলে তাদের কিছুসংখ্যক যুদ্ধবন্দীও মুসলমানদের করতলগত হয়। ইসলামী আইন অনুযায়ী সব কয়েদী ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুজাহিদগণের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়। কয়েদীদের মধ্যে হারেস ইবনে যেরারের কন্যা জুয়ায়রিয়াও ছিলেন। তিনি সাবেত ইবনে কায়েস (রা)-এর ভাগে পড়েন। সাবেত (রা) জুয়ায়রিয়াকে কিতাবতের প্রথায় মুক্ত করে দিতে চাইলেন। এর অর্থ এই যে, দাস অথবা দাসী মেহনত-মজুরি করে অথবা ব্যবসায়ের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে মালিককে দিলে সে মুক্ত হয়ে যেত।

জুয়ায়রিয়ার যিম্মায় মোটা অংকের অর্থ নির্ধারণ করা হয়েছিল, যা পরিশোধ করা সহজসাধ্য ছিল না। তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খেদমতে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলেনঃ আমি মুসলমান হয়ে গেছি। আমি সাক্ষ্য দিই যে, আল্লাহ্ এক। তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং আপনি আল্লাহ্র রসূল। অতঃপর নিজের ঘটনা শুনালেন যে, সাবেত ইবনে কায়েস (রা) আমার সাথে কিতাবতের চুক্তি করেছে। কিন্তু কিতাবতের অর্থ পরিশোধ করার সাধ্য আমার নেই। আপনি এ ব্যাপারে আমাকে কিছু সাহায্য করুন।

রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর আবেদন মঞ্জুর করলেন এবং সাথে সাথে তাঁকে মুক্ত করে

বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। জুয়ায়রিয়ার জন্য এর চাইতে বড় সৌভাগ্য আর কি হতে পারত! তিনি সানন্দে প্রস্তাব মেনে নিলেন। এ ভাবে তিনি পুণ্যময়ী বিবিগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। উম্মুল-মু'মিনীন হযরত জুয়ায়রিয়া (রা) বর্ণনা করেন ঃ "রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বনিল-মুস্তালিক যুদ্ধে গমনের তিন দিন পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম, ইয়াসরিবের (মদীনার) দিক থেকে চাঁদ রওয়ানা হয়ে আমার কোলে এসে লুটিয়ে পড়েছে। তখন আমি এই স্বপ্ন কারও কাছে বর্ণনা করিনি। কিন্তু এখন তার ব্যাখ্যা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।"

তিনি ছিলেন গোত্রপতির কন্যা। তিনি যখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পুণ্যময়ী বিবিদের কাতারে শামিল হয়ে গেলেন, তখন এর শুভ প্রতিক্রিয়া তাঁর গোত্রের উপরও প্রতিফলিত হয়। তাঁর সাথে বন্দিনী অন্য নারীরাও এই শুভ বিবাহের উপকারিতা লাভ করল। কেননা, এই বিবাহের কথা জানাজানি হওয়ার পর যে যে মুসলমানের কাছে তাঁর আত্মীয় কোন বন্দিনী ছিল, তারা সবাই তাদেরকে মুক্ত করে দিল। এভাবে একশ বন্দিনী তাঁর সাথে মুক্ত হয়ে গেল। এরপর তাঁর পিতাও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র একটি মো'জেযা দেখে মুসলমান হয়ে গেলেন।

এই ঘটনায় গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশ ঃ উপরোক্ত ঘটনা সূরা মুনাফিকুনের তফসীর বোঝার পক্ষে যেমন সহায়ক, তেমনি এতে প্রসঙ্গত নৈতিক চরিত্র, রাজনীতি ও সামাজিকতা সম্পর্কিত অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশ এবং সমস্যার সমাধানও নিহিত রয়েছে। তাই এখানে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা সঙ্গত মনে করা হচ্ছে। দিকনির্দেশগুলো এই ঃ

ইসলামে বর্ণ, বংশ, ভাষা এবং দেশী ও বিদেশীর পার্থক্য মূল্যহীন ঃ বনিল মুস্তালিক যুদ্ধে সংঘটিত একজন আনসার ও একজন মুহাজিরের ঝগড়া এবং উভয় পক্ষ থেকে আনসার ও মুহাজির সম্প্রদায়কে আহ্বান করার সমগ্র ব্যাপারটি ছিল বিলীয়মান জাহিলিয়াত যুগের একটি প্রভাব বিশেষ। রসূলুল্লাহ্ (সা) এই অপপ্রভাবের মূলে কুঠারাঘাত করেছিলেন এবং যে কোন স্থানের অধিবাসী, যে কোন বর্ণ, ভাষা, বংশ ও সম্প্রদায়ের মুসলমানদেরকে পরস্পরের মধ্যে নিবিড় ভ্রাতৃবন্ধনের অনুভূতিতে উদ্বেলিত করে দিয়েছিলেন। তিনি আনসার ও মুহাজিরগণের মধ্যে নিয়মিত ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে তাদেরকে অভিন্ন ইসলামী সমাজে গ্রথিত করেছিলেন। কিন্তু শয়তান তার চিরাচরিত জালে মানুষকে আবদ্ধ করে পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের সময় সম্প্রদায়, দেশ, ভাষা, বর্ণ ইত্যাদিকে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সাহায্যের ভিত্তিরূপে প্রকট করে তোলে। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সাহায্যের ইসলামী মাপকাঠি ন্যায় ও সুবিচার মানুষের চিন্তাধারা থেকে উধাও হয়ে যায় এবং শুধু গোষ্ঠী ও জাতীয়তার ভিত্তিতে একে অপরকে সাহায্য করার নীতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এভাবে শয়তান মুসলমানকে মুসলমানের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত করে। উপরোক্ত ঝগড়ার ঘটনায়ও এমনি পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) যথাসময়ে অকুস্থলে পৌঁছে এই অনর্থের অবসান ঘটান এবং বলেন যে, এটা মূর্খতা ও কুফরের দুর্গন্ধযুক্ত অনুভূতি। এ থেকে বিরত হও। অতঃপর তিনি সবাইকে কোরআনী সহযোগিতা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করে দেন। এই নীতি হচ্ছে ঃ

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

অর্থাৎ মুসলমানদের জন্য কাউকে সাহায্য করা ও কারও কাছ থেকে সাহায্য নেওয়ার মাপ-কাঠি এই যে, যে ব্যক্তি ন্যায় ও সুবিচারে অবিচল, তাকে সাহায্য কর, যদিও সে বংশ, পরিবার, ভাষা ও দেশগতভাবে তোমা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন পাপ ও অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকে, তাকে কখনও সাহায্য করো না, যদিও সে তোমার পিতা ও ভ্রাতা হয়। এই যৌক্তিক ও ন্যায়ভিত্তিক মাপকাঠিই ইসলাম কায়েম করেছে এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) প্রতি পদক্ষেপে এ নীতির প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন ও সবাইকে এর অনুসরণ করতে বলেছেন। তিনি বিদায় হজ্জের সর্বশেষ ভাষণে ঘোষণা করেন ঃ মূর্খতা যুগের সকল কুপ্রথা আমার পদতলে পিষ্ট হয়েছে। এখন আরব, অনারব, কৃষ্ণকায়, শ্বেতকায় এবং দেশী ও বিদেশীর প্রতিমা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সাহায্যের ইসলামী ভিত্তি একমাত্র ন্যায় ও ইনসাফ। সবাইকে এর অনুগামী হতে হবে।

এই ঘটনা আমাদেরকে এ শিক্ষাও দিয়েছে যে, ইসলামের শত্রুরা আজ থেকে নয় ---আদিকাল থেকেই মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট করার জন্য গোষ্ঠীগত ও দেশগত জাতীয়-তার অস্ত্র ব্যবহার করেছে। তারা যখন ও যে মুহূর্তে সুযোগ পায়, এই অস্ত্র ব্যবহার করে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে।

পরিতাপের বিষয়, দীর্ঘকাল থেকে মুসলমানরা আবার এই শিক্ষা ভুলে গেছে এবং বিজাতীয় শত্রুরা মুসলমানদের ইসলামী ঐক্য খণ্ড-বিখণ্ড করার কাজে আবার সে শয়তানী চক্রান্ত জাল বিস্তার করেছে। ধর্ম ও ধর্মীয় মূলনীতির প্রতি উদাসীনতার কারণে আজকের যুগের মুসলমানরা এই জালে আবদ্ধ হয়ে পারস্পরিক গৃহযুদ্ধের শিকার হয়ে গেছে এবং কুফর ও ধর্মদ্রোহিতার মুকাবিলায় তাদের একক শক্তি বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়েছে। কেবল আরব ও অনারবই নয়, মিসরীয়, সিরীয়, হেজাযী, ইয়ামনীও আজ পরস্পরে ঐক্যবদ্ধ নয়। এ উপমহাদেশেও পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী, সিন্ধী, হিন্দী, পাঠান এবং বেলুচরাও পারস্পরিক কলহের শিকার হয়ে গেছে। ইসলামের শত্রুরা আমাদের মধ্যকার তুচ্ছ বৈষয়িক কলহ-বিবাদ নিয়ে খেলায় মেতেছে। এর ফলশ্রুতিতে তারা প্রতি ক্ষেত্রেই আমাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করছে এবং আমরা সর্বত্রই পরাজিত ও দাসসুলভ চিন্তাধারার নিগড়ে আবদ্ধ হয়ে তাদের কাছেই আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছি। আল্লাহ্ করুন, আজও যদি মুসলমানরা কোরআ-নের মূলনীতি ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দিকনির্দেশ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে, বিজাতির তরসায় জীবন ধারণ করার পরিবর্তে স্বয়ং ইসলামী সমাজকে সুসংহত করে এবং বর্ণ, বংশ, ভাষা ও স্ব স্ব ভৌগোলিক সীমারেখার প্রতিমাকে আবার একবার ভেঙ্গে মিসমার করে দেয়, তবে আজও তারা আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ও সমর্থন খোলা চোখেই প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হবে।

ইসলামী মূলনীতিতে সাহাবায়ে কিরামের অপূর্ব দৃঢ়তা ঃ উপরোক্ত ঘটনা এ কথাও ব্যক্ত করেছে যে, যদিও শয়তান সাময়িকভাবে কিছু লোককে মূর্খতা যুগের শ্লোগানে লিপ্ত করে দিয়েছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকের অন্তর ঈমানে পরিপূর্ণ ছিল। সামান্য হুঁশিয়ারি পেয়ে সবাই ভ্রান্ত ধারণা থেকে তওবা করে নেয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ্ ও রসূলের মহব্বত

এবং সম্ভ্রম এমনই বদ্ধমূল ছিল, যাতে আত্মীয়তা ও জাতীয়তা সম্পর্কে কোনরূপ অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারেনি। এর প্রমাণ এই ঘটনায় প্রথমে যায়েদ ইবনে আরকাম (রা)-এর বিবৃতি থেকে ফুটে উঠেছে। তিনি নিজেও ছিলেন খাযরাজ গোত্রের লোক এবং ইবনে উবাই ছিল গোত্রের সরদার। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা)-ও তার সম্মান ও সম্ভ্রমের প্রবক্তা ছিলেন। কিন্তু যখন মাননীয় সরদারের মুখে মু'মিন, মুহাজির ও স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিরুদ্ধে কথাবার্তা উচ্চারিত হল, তখন তিনি সহ্য করতে পারলেন না। সেই মজলিসেই সরদারকে দাঁতভাঙা জওয়াব দিলেন। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে অভিযোগ করলেন। আজ-কালকার গোষ্ঠী প্রীতি হলে তিনি কখনও আপন গোত্র সরদারের এই কথা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে পৌঁছাতেন না।

এই ঘটনায় স্বয়ং ইবনে উবাইয়ের পুত্র আবদুল্লাহ্ (রা)-র আচরণ এ বিষয়টিকে অত্যন্ত উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে তুলেছে যে, তার মহব্বত ও সম্ভ্রম কেবল আল্লাহ্ ও রসূলের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। তিনি যখন পিতার মুখে বিরুদ্ধাচরণের কথাবার্তা শুনলেন, তখন রসূ-লুল্লাহ্ (সা)-র কাছে হাযির হয়ে নিজ হাতে পিতার মস্তক কেটে আনার প্রস্তাব রাখলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) নিষেধ করে দিলে মদীনার সন্নিকটে পৌঁছে পিতার সওয়ারী বসিয়ে দিলেন এবং মদীনায় প্রবেশের পথ রুদ্ধ করে পিতাকে এ কথা স্বীকার করে নিতে বাধ্য করলেন যে, সম্মানের অধিকারী একমাত্র রসূলুল্লাহ্ (সা) এবং সে নিজে হেয় ও লাঞ্ছিত। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অনুমতি লাভের পূর্বে পিতার পথ খুলে দিলেন না। এই দৃশ্য দেখে স্বতঃ-স্ফূর্তভাবে মুখে উচ্চারিত হয় ঃ

تو نخل خوش ثمر کیستی که سرو و سمن
همه زخویش برید ند و با تو پیو ستند

এ ছাড়া বদর, ওহুদ ও আহযাবের যুদ্ধগুলো তো তরবারির মাধ্যমে এই সম্প্রদায় প্রীতি ও স্বদেশ প্রীতির প্রতিমাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে উড়িয়ে দিয়েছে এবং এ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, যে কোন সম্প্রদায়, দেশ, বর্ণ ও ভাষার মুসলমান পরস্পরে ভাই ভাই। যারা আল্লাহ্ ও রসূলকে মানে না, তারা সত্যিকার ভাই ও পিতা হলেও দুশমন।

هزار خویش که بیگا نه از خدا باشد
خدا ئے یک تن بیگا نه کا شنا باشد

মুসলমানদের সাধারণ স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং তাদেরকে ভুল বোঝাবুঝি থেকে রক্ষা করার গুরুত্ব ঃ এই ঘটনা আমাদেরকে আরও শিক্ষা দিয়েছে যে, যে কাজ স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে বৈধ, কিন্তু তা বাস্তবায়নে মুসলমানদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির আশংকা থাকে অথবা শত্রুরা ভুল বোঝাবুঝি প্রচার করার সুযোগ লাভ করে, সেই কাজ না করাই কর্তব্য। উদাহরণত রসূলুল্লাহ্ (সা) মুনাফিক সরদার ইবনে উবাইয়ের কপটতা মূর্ত হয়ে ফুটে উঠার পরও হযরত ওমর (রা)-এর এই পরামর্শ গ্রহণ করেন নি যে, তাকে হত্যা করা হোক।

কেননা, এতে আশংকা ছিল যে, শত্রুরা সাধারণ মানুষের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি প্রচার করার সুযোগ লাভ করবে এবং বলবে ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাহাবীদেরকেও হত্যা করেন।

কিন্তু অন্যান্য রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত আছে যে, যে সব কাজ শরীয়তের মূল উদ্দেশ্য নয়, সে সব কাজ মোস্তাহাব হলেও ভুল বোঝাবুঝির আশংকার কারণে বর্জন করা যায়। কিন্তু শরীয়তের মূল উদ্দেশ্যকে এ ধরনের আশংকার কারণে ত্যাগ করা যায় না; বরং এরূপ ক্ষেত্রে আশংকা অবসানের চেষ্টা করতে হবে এবং কাজটি বাস্তবায়ন করতে হবে। এখন সূরার বিশেষ বিশেষ বাক্যের ব্যাখ্যা দেখুন ঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ—মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের ব্যাপারে সূরা মুনাফিকুন নাযিল হয়েছে। এতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তার কসম সবই মিথ্যা। এই মুনাফিক সরদারের হিতাকাংক্ষায় কেউ কেউ তাকে বলল ঃ তুই জানিস কোরআনে তোর সম্পর্কে কি নাযিল হয়েছে? এখনও সময় আছে, তুই রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে হাযির হয়ে অপরাধ স্বীকার করে নে। রসূলুল্লাহ্ (সা) তোর জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। সে উত্তরে বলল ঃ তোমরা আমাকে বিশ্বাস স্থাপন করতে বলেছিলে, আমি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। এরপর তোমরা আমাকে অর্থ-সম্পদের যাকাত দিতে বলেছিলে, আমি তাও দিতেছি। এখন আর কি বাকী রইল? আমি কি মুহাম্মদ (সা)-কে সিজদা করব? এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। এতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যখন তার অন্তরে ঈমানই নেই, তখন তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা উপকারী হতে পারে না।

এই ঘটনার পর ইবনে উবাই মদীনায় পৌঁছে বেশীদিন জীবিত থাকেনি—শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।—(মাযহারী)

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا—জাহ্জাহ্ মুহাজির ও সিনান আনসারীর ঝগড়ার সময় ইবনে উবাই-ই একথা বলেছিল। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এর এই জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, নির্বোধরা মনে করে মুহাজিরগণ তাদের দান-খয়রাতের মুখাপেক্ষী এবং ওরাই তাদের অন্ন যোগায়। অথচ সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ধনভাণ্ডার আল্লাহ্র হাতে। তিনি ইচ্ছা করলে মুহাজিরগণকে তোমাদের কোন সাহায্য ছাড়াই সবকিছু দিতে পারেন। ইবনে উবাইয়ের এরূপ মনে করা নির্বুদ্ধিতা ও বোকামির পরিচায়ক। তাই কোরআন পাক এ স্থলে لَا يَفْقَهُوْنَ বলে ব্যক্ত করেছে যে, যে এরূপ মনে করে, সে বেওকুফ ও নির্বোধ।

يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ—

এটাও ইবনে উবাইয়ের উক্তি। এই উক্তির ভাষা অস্পষ্ট হলেও উদ্দেশ্য অস্পষ্ট ছিল না যে, সে নিজেকে এবং মদীনার আনসারগণকে শক্তিশালী ও ইযযতদার এবং এর বিপরীতে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুহাজির সাহাবায়ে কিরামকে দুর্বল ও হেয় বলে প্রকাশ করেছিল। সে মদীনার আনসারগণকে উত্তেজিত করেছিল, যাতে তারা এই দুর্বল ও 'হেয়' লোকদেরকে মদীনা থেকে বহিষ্কৃত করে দেয়। আল্লাহ্ তা'আলা এর জওয়াবে তার কথা তারই দিকে উল্টে দিয়েছেন যে, যদি ইযযত ওয়ালারা 'হেয়' লোকদেরকে বের করেই দেয়, তবে এর কুফল তোমাদেরকেই ভোগ করতে হবে। কেননা, ইযযত তো আল্লাহ্র, তাঁর রসূলের এবং মু'মিনদের প্রাপ্য। কিন্তু মূর্খতার কারণে তোমরা এ সম্পর্কে বেখবর। এখানে কোরআন لَا يَعْلَمُونَ এবং এর আগে لَا يَفْقَهُونَ শব্দ ব্যবহার করেছে। এই পার্থক্যের কারণ এই যে, কোন মানুষ নিজেকে অন্যের রিযিকদাতা মনে করলে এটা নিরেট জ্ঞান বুদ্ধির পরিপন্থী এবং নির্বুদ্ধিতার আলামত। পক্ষান্তরে ইযযত ও অপমান দুনিয়াতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনে লাভ করে। তাই এতে বিভ্রান্তি হলে সেটা বেখবর ও অনভিজ্ঞ হওয়ার প্রমাণ। তাই এখানে لَا يَعْلَمُونَ বলা হয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ
اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩﴾ وَأَنْفِقُوا
مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا
أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾ وَلَنْ
يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

(৯) হে মু'মিনগণ! তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয়, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। (১০) আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে বলবে: হে আমার পালনকর্তা! আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। (১১) প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ্ কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে বিষয়ে খবর রাখেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মু'মিনগণ! তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি (অর্থাৎ দুনিয়ার সবকিছু) যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ (ও আনুগত্য অর্থাৎ গোটা দীন) থেকে গাফেল না করে (অর্থাৎ তোমরা দুনিয়াতে এমন মগ্ন হয়ো না যাতে দীনের ক্ষতি হয়)। যারা এরূপ করবে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (কারণ দুনিয়ার উপকার তো ধ্বংস হয়ে যাবে; পরকালের ক্ষতি দীর্ঘ অথবা চিরস্থায়ী থেকে যাবে। لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ এর ব্যাপক বিষয়বস্তু থেকে একটি বিশেষ আর্থিক ইবাদত অর্থাৎ সদকার আদেশ করা হচ্ছে ঃ) আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে (জরুরী প্রাপ্য) মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে (পরিতাপ করে) বলবে ঃ হে আমার পালনকর্তা! আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎ কর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। (তার এই বাসনা ও পরিতাপ মোটেই উপকারী হবে না। কারণ) প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন (খতম হয়ে) আসে, তখন আল্লাহ্ কাউকে অবকাশ দেন না। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত (কাজেই যেমন করবে, তেমনি ফল পাবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ---এই সূরার প্রথম রুকূতে মুনাফিকদের মিথ্যা শপথ ও চক্রান্ত উল্লেখ করা হয়েছিল। দুনিয়ার মহব্বতে পরাভূত হওয়াই ছিল এ সব কিছুর সারমর্ম। এ কারণেই তারা একদিকে মুসলমানদের কবল থেকে আত্মরক্ষা এবং অপরদিকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদে ভাগ বসাবার উদ্দেশ্যে বাহ্যত নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করত। মুহাজির সাহাবীদের পেছনে ব্যয় করার ধারা বন্ধ করার যে চক্রান্ত তারা করেছিল, এর পশ্চাতেও এ কারণই নিহিত ছিল। এই দ্বিতীয় রুকূতে খাঁটি মু'মিনদেরকে সম্বোধন করে সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমরা মুনাফিকদের ন্যায় দুনিয়ার মহব্বতে মগ্ন হয়ে যেয়ো না। যেসব বিষয় মানুষকে দুনিয়াতে আল্লাহ্ থেকে গাফেল করে, তন্মধ্যে দুটি সর্ববৃহৎ---ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি। তাই এই দুটির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। নতুবা দুনিয়ার যাবতীয় ভোগ-সম্ভারই উদ্দেশ্য। আয়াতের সারমর্ম এই যে, ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততির মহব্বত সর্বাবস্থায় নিন্দনীয় নয়। বরং এগুলো নিয়ে ব্যাপৃত থাকা এক পর্যায়ে কেবল জায়েযই নয়---ওয়াজিবও হয়ে যায়। কিন্তু সর্বদা এই সীমানার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এসব বস্তু যেন মানুষকে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফেল না করে দেয়। এখানে 'আল্লাহ্‌র স্মরণের' অর্থ কোন কোন তফসীরবিদের মতে পাঞ্জেগানা নামায, কারও মতে হজ্জ ও যাকাত এবং কারও মতে কোরআন। হযরত হাসান বসরী (র) বলেন ঃ স্মরণের অর্থ এখানে যাবতীয় আনুগত্য ও ইবাদত। এই অর্থ সব কিছুতে পরিব্যাপ্ত।---(কুরতুবী)

সারকথা এই যে, আল্লাহ্‌র স্মরণ তথা ইবাদত থেকে মানুষকে গাফেল করে না, এতটুকু পর্যন্ত সাংসারিক বিষয়াদিতে ব্যাপৃত থাকার অনুমতি আছে। সাংসারিক বিষয়াদিতে

এতটুকু ডুবে যাওয়া উচিত নয় যে, ফরয ও ওয়াজিব কর্মে বিঘ্ন দেখা দেয় অথবা হারাম ও মকরূহ কাজে লিপ্ত হওয়া জরুরী হয়ে পড়ে। যারা সাংসারিক কাজে এরূপ মগ্ন হয়ে পড়ে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ অর্থাৎ তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। কারণ, তারা পরকালের মহান ও চিরন্তন নিয়ামতসমূহের পরিবর্তে দুনিয়ার নিকৃষ্ট ও ক্ষণস্থায়ী নিয়ামত অবলম্বন করে। এর চাইতে বড় ক্ষতি আর কি হবে।

وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ—এই আয়াতে মৃত্যু আসার অর্থ মৃত্যুর লক্ষণাদি প্রকাশ পাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুর লক্ষণাদি সামনে আসার আগেই স্বাস্থ্য ও শক্তি অটুট থাকা অবস্থায় তোমাদের ধনসম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে পরকালের পুঁজি করে নাও। নতুবা মৃত্যুর পর এই ধনসম্পদ তোমাদের কোন কাজে আসবে না। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, 'আল্লাহ্‌র স্মরণের' অর্থ যাবতীয় ইবাদত ও শরীয়তের আদেশ-নিষেধ পালন করা। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ধনসম্পদ ব্যয় করাও এর অন্তর্ভুক্ত। এরপর এখানে অর্থ ব্যয় করাকে পৃথকভাবে বর্ণনা করার দুটি কারণ হতে পারে। এক. আল্লাহ্ ও তাঁর আদেশ-নিষেধ পালনে মানুষকে গাফেলকারী সর্ববৃহৎ বস্তু হচ্ছে ধন সম্পদ। তাই যাকাত, ওশর, হজ্ব ইত্যাদি আর্থিক ইবাদত স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। দুই. মৃত্যুর লক্ষণাদি দৃষ্টির সামনে আসার সময় কারও সাধ্য নেই এবং কেউ কল্পনাও করতে পারে না যে, কাযা নামাযগুলো পড়ে নেবে, কাযা হজ্ব আদায় করবে অথবা কাযা রোযা রাখবে। কিন্তু ধনসম্পদ সামনে থাকে এবং এ বিশ্বাস হয়েই যায় যে, এখন এই ধন তার হাত থেকে চলে যাবে। তখনও তাড়াতাড়ি ধনসম্পদ ব্যয় করে আর্থিক ইবাদতের ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে। এছাড়া দান-খয়রাত যাবতীয় আপদ-বিপদ দূর করার ব্যাপারেও কার্যকর।

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করল ঃ কোন্ সদকায় সর্বাধিক সওয়াব পাওয়া যায়? তিনি বললেন ঃ যে সদকা সুস্থ অবস্থায় এবং ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করে ---অর্থ ব্যয় করে ফেললে নিজেই দরিদ্র হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকা অবস্থায় করা হয়। তিনি আরও বললেন ঃ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করাকে সেই সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করো না, যখন আত্মা তোমার কণ্ঠনালীতে এসে যায় এবং তুমি মরতে থাক আর বল ঃ এই পরিমাণ অর্থ অমুককে দিয়ে দাও, এই পরিমাণ অর্থ অমুক কাজে ব্যয় কর।

فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ—হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এই আয়াতের তফসীরে বলেন ঃ যে ব্যক্তির যিম্মায় যাকাত ফরয ছিল কিন্তু আদায় করেনি অথবা হজ্ব ফরয ছিল কিন্তু আদায় করেনি, সে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে বাসনা প্রকাশ করে বলবে ঃ আমি আবার দুনিয়াতে ফিরে যেতে চাই

অর্থাৎ মৃত্যু আরও কিছু বিলম্বে আসুক যাতে আমি সদকা-খয়রাত করে নেই এবং ফরয কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে যাই। أَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ—অর্থাৎ কিছু অবকাশ পেলে এমন সৎ কর্ম করে নেব, যদ্দ্বারা সৎ কর্ম পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। যেসব ফরয বাদ পড়েছে, সেগুলো পূর্ণ করে নেব এবং যেসব হারাম ও মকরূহ কাজ করেছি, সেগুলো থেকে তওবা করে নেব। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা বলে দিয়েছেন যে, মৃত্যু আসার পর কাউকে অবকাশ দেওয়া হয় না। সুতরাং এই বাসনা নিরর্থক।

سورة التغابن

সূরা তাগাবুন

মদীনায় অবতীর্ণ, ১৮ আয়াত, ২ রুকূ'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۚ
وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝١ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ
مُّؤْمِنٌ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝٢ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝٣ يَعْلَمُ مَا
فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۚ وَاللّٰهُ
عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝٤ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ
ۖ فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝٥ ذٰلِكَ بِاَنَّهٗ كَانَتْ
تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْٓا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا ۖ فَكَفَرُوْا وَ
تَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ ۚ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ۝٦ زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا
اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ۚ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ
وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝٧ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا ۚ
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝٨ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ۖ ذٰلِكَ يَوْمُ
التَّغَابُنِ ۚ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ
وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ
اَبَدًا ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝٩ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ
اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝١٠

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। (২) তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফির এবং কেউ মু'মিন। তোমরা যা কর, আল্লাহ্‌ তা দেখেন। (৩) তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর সুন্দর করেছেন তোমাদের আকৃতি। তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন। (৪) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, তিনি তা জানেন। তিনি আরও জানেন তোমরা যা গোপনে কর এবং যা প্রকাশ্যে কর। আল্লাহ্‌ অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। (৫) তোমাদের পূর্বে যারা কাফির ছিল, তাদের বৃত্তান্ত কি তোমাদের কাছে পৌঁছেনি? তারা তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছে এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৬) এটা এ কারণে যে, তাদের কাছে তাদের রসূলগণ প্রকাশ্য নিদর্শনাবলীসহ আগমন করলে তারা বলত: মানুষই কি আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করবে? অতঃপর তারা কাফির হয়ে গেল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। এতে আল্লাহ্‌র কিছু আসে যায় না। আল্লাহ্‌ পরওয়াহীন, প্রশংসার্হ। (৭) কাফিররা দাবী করে যে, কখনও পুনরুত্থিত হবে না। বলুন, অবশ্যই হবে, আমার পালনকর্তার কসম, তোমরা নিশ্চয় পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমাদেরকে অবহিত করা হবে যা তোমরা করতে। এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ। (৮) অতএব তোমরা আল্লাহ্‌, তাঁর রসূল এবং অবতীর্ণ নূরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমরা যা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ্‌ সম্যক অবগত। (৯) সেদিন অর্থাৎ সমাবেশের দিন আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে একত্রিত করবেন। এ দিন হার জিতের দিন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎ কর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ্‌ তার পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে। তারা তথায় চিরকাল বসবাস করবে। এটাই মহাসাফল্য। (১০) আর যারা কাফির এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, তারা তথায় অনন্তকাল থাকবে। কতই না মন্দ প্রত্যাবর্তন স্থল এটা!

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে (মুখে অথবা অবস্থার মাধ্যমে) রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (এটা পরবর্তী বর্ণনার ভূমিকা অর্থাৎ যিনি এমন পূর্ণতাগুণে গুণান্বিত, তাঁর আনুগত্য ওয়াজিব এবং অবাধ্যতা গোনাহ্‌)। তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন (এ কারণে সবারই তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত ছিল)। কিন্তু (এতদসত্ত্বেও) তোমাদের মধ্যে কেউ কাফির এবং কেউ মু'মিন। আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের (ঈমান ও কুফরের) কাজকর্ম দেখেন। (সুতরাং প্রত্যেককে উপযুক্ত প্রতিদান দেবেন)। তিনিই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে যথাযথভাবে (অর্থাৎ প্রজ্ঞাপূর্ণ ও উপকারিতা পূর্ণরূপে) সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর সুন্দর করেছেন তোমাদের আকৃতি। (কেননা

মানবাকৃতির সমান কোন জীবের আকৃতিতে সৌষ্ঠব নেই)। তাঁর কাছে (সবার) প্রত্যাবর্তন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা আছে, তিনি সব জানেন। তিনি আরও জানেন তোমরা যা গোপনে কর এবং যা প্রকাশ্যে কর। আল্লাহ্ অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞাত। (এসব বিষয়ের দাবী এই যে, তোমরা তাঁর আনুগত্য কর। এছাড়াও) তোমাদের পূর্বে যারা কাফির ছিল, তাদের বৃত্তান্ত কি তোমাদের কাছে পৌঁছেনি? (এসব বৃত্তান্তও তোমাদের আনুগত্যকে ওয়াজিব করে)। অতঃপর তারা তাদের কর্মের শাস্তি (দুনিয়াতেও) আস্বাদন করেছে এবং (এ ছাড়া পরকালে) তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ আযাব। এটা (অর্থাৎ ইহকাল ও পরকালের শাস্তি) এ কারণে যে, তাদের কাছে তাদের রসূলগণ প্রকাশ্যে নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমন করলে তারা (রসূলগণের সম্পর্কে) বলাবলি করত--মানুষই কি আমাদেরকে পথপ্রদর্শন করবে (অর্থাৎ মানুষ কি কখনও পয়গম্বর ও পথপ্রদর্শক হতে পারে)? মোটকথা, তারা কাফির হয়ে গেল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। আল্লাহ্ তা'আলাও তাদের পরোয়া করলেন না (বরং পর্যুদস্ত করে দিলেন)। আল্লাহ্ (সবকিছু থেকে) পরোয়াহীন (এবং) প্রশংসার্হ। (কারও অবাধ্যতায় তাঁর কোন ক্ষতি হয় না এবং আনুগত্যে উপকার হয় না। স্বয়ং অনুগত ও অবাধ্যেরই লাভ লোকসান হয়)। কাফিররা (لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ বাক্যে পরকালীন আযাবের কথা শুনে) দাবী করে যে, তারা কখনও পুনরুত্থিত হবে না (যার পর عذاب أليم হওয়ার কথা) আপনি বলে দিন, অবশ্যই হবে; আমার পালনকর্তার কসম, তোমরা নিশ্চয়ই পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমাদেরকে অবহিত করা হবে যা তোমরা করতে (এবং তদনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হবে)। এটা (অর্থাৎ পুনরুত্থান ও প্রতিদান) আল্লাহ্র পক্ষে (সর্বশক্তিমান হওয়ার কারণে) সম্পূর্ণ সহজ। অতএব (ঈমানের এসব কারণ উপস্থিত আছে বলে) তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং আমার অবতীর্ণ নূরের অর্থাৎ কোরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমরা যা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবগত। (স্মরণ কর) যেদিন আল্লাহ্ তোমাদেরকে সমাবেশ দিবসে একত্র করবেন। এদিনই লাভ লোকসান জাহির হওয়ার দিন। (অর্থাৎ মুসলমানদের লাভ এবং কাফিরদের লোকসান এই দিনে কার্যত জাহির হবে। এর বর্ণনা এই যে,) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং সৎ কর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ্ তার পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তাকে (জান্নাতের) উদ্যানে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে। তথায় তারা চিরকাল বসবাস করবে। এটা মহাসাফল্য। আর যারা কাফির এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। তারা তথায় অনন্তকাল থাকবে। এটা খুব মন্দ প্রত্যাবর্তন স্থান।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ — অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর তোমাদের কেউ কাফির এবং কেউ মু'মিন হয়ে গেছে। এখানে فَمِنْكُمْ এর فَا অব্যয়টি এই অর্থ জ্ঞাপন করে যে, প্রথমে সৃষ্টি করার সময় কোন কাফির

ছিল না। এই কাফির ও মু'মিনের বিভেদ পরে সেই ইচ্ছা ও ক্ষমতার অধীনে হয়েছে, যা আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে দান করেছেন। এই ইচ্ছা ও ক্ষমতার কারণেই মানুষের উপর গোনাহ্ ও সওয়াব আরোপিত হয়। এক হাদীসেও এই অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه و ينصرانه ---অর্থাৎ প্রত্যেক সন্তান নির্মল স্বভাব-ধর্মের উপর জন্মগ্রহণ করে (যার ফলে তার মু'মিন হওয়া স্বাভাবিক ছিল)। কিন্তু এরপর তার পিতামাতা তাকে ইহুদী, খৃস্টান ইত্যাদিতে পরিণত করে।---(কুরতুবী)

দ্বিজাতি তত্ত্ব ঃ কোরআন পাক এ স্থলে মানব জাতিকে দুই দলে বিভক্ত করেছে-- কাফির ও মু'মিন। এতে বোঝা যায় যে, আদম সন্তানরা সবই এক গোষ্ঠীভুক্ত এবং বিশ্বের সমস্ত মানুষ এই গোষ্ঠীর ব্যক্তিবর্গ। এই গোষ্ঠীকে ছিন্নকারী এবং আলাদা দল সৃষ্টিকারী বিষয় হচ্ছে একমাত্র কুফর। যে ব্যক্তি কাফির হয়ে যায়, সে মানবগোষ্ঠীর এই সম্পর্ককে ছিন্ন করে। এভাবে সমগ্র বিশ্বে মানুষের দলাদলি একমাত্র ঈমান ও কুফরের ভিত্তিতে হতে পারে। বর্ণ, ভাষা, বংশ, পরিবার ও দেশ ইত্যাদির মধ্য থেকে কোনটিই মানবগোষ্ঠীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে পারে না। এক পিতার সন্তানরা যদি বিভিন্ন শহরে বসবাস করে অথবা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে অথবা তাদের বর্ণ বিভিন্ন রূপ হয়, তবে তারা আলাদা আলাদা দল হয়ে যায় না। এসব বিভিন্নতা সত্ত্বেও তারা সবাই পরস্পরে ভাই ভাই গণ্য হয়। কোন বুদ্ধিমান মানুষ তাদেরকে বিভিন্ন আখ্যা দিতে পারে না।

মূর্খতা যুগে বংশ ও গোত্রের বিভেদকে জাতীয়তা ও দলাদলির ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছিল। এমনিভাবে দেশ ও মাতৃভূমির ভিত্তিতে কিছু দলাদলি মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে রসূলুল্লাহ্ (সা) এসব প্রতিমাকে ভেঙে দেন। তাঁর মতে মুসলমান যে কোন দেশ, যে কোন ভূখণ্ড, যে কোন বর্ণ ও পরিবারের হোক, তারা এক গোষ্ঠীভুক্ত। কোরআন বলে ঃ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ মু'মিনগণ সবাই পরস্পরে ভাই ভাই। এমনিভাবে কাফির যে কোন দেশ অথবা সম্প্রদায়ের হোক, তারা সবাই এক মিল্লাত ও এক জাতি।

কোরআন পাকের উপরোক্ত আয়াতও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এতে সমগ্র আদম সন্তানকে মু'মিন ও কাফির---এই দুই দলে বিভক্ত করা হয়েছে। বর্ণ ও ভাষার বিভেদকে কোরআন আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তির বহিঃপ্রকাশ এবং মানুষের জীবিকা সম্পর্কিত অনেক উপকার অর্জনের ভিত্তি হওয়ার কারণে একটি মহান অবদান আখ্যা দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু একে মানব জাতির মধ্যে দলাদলি সৃষ্টির উপায় হিসাবে ব্যবহার করার অনুমতি দেয়নি।

ঈমান ও কুফরের কারণে দুই জাতির বিভেদ একটি ইচ্ছাধীন বিষয়ের উপর ভিত্তিশীল। কেননা ঈমান ও কুফর উভয়টিই মানুষের ইচ্ছাধীন ব্যাপার। কেউ এক জাতীয়তা

ত্যাগ করে অন্য জাতীয়তা অবলম্বন করতে চাইলে অতি সহজেই তা করতে পারে অর্থাৎ নিজের বিশ্বাস ও মতবাদ পরিবর্তন করে অন্য দলে শামিল হতে পারে। এর বিপরীতে বংশ, পরিবার, বর্ণ, ভাষা ও দেশ কোন মানুষের ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। কেউ নিজের বংশ ও বর্ণ পরিবর্তন করতে পারে না। ভাষা ও দেশ যদিও পরিবর্তন করা যায়, কিন্তু যেসব জাতি ভাষা ও দেশের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তারা স্বভাবত অন্য ভাষাভাষী ও অন্য দেশের অধিবাসীকে নিজেদের মধ্যে সাদরে গ্রহণ করতে সম্মত হয় না, যদিও সে তাদের ভাষা বলতে শুরু করে এবং তাদের দেশে বসবাস অবলম্বন করে।

এই ইসলামী গোষ্ঠী ও ঈমানী ভ্রাতৃত্বই অল্পদিনের মধ্যে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণের এবং কৃষ্ণকায়, শ্বেতকায়, আরব ও আজমে অসংখ্য ব্যক্তিকে এক সূতায় গ্রথিত করে দিয়েছিল। এই শক্তির মুকাবিলা বিশ্বের জাতিসমূহ করতে পারেনি। তাই তারা সেই প্রতিমাগুলোকে পুনরায় জীবিত করার প্রয়াস পেল, যেগুলোকে রসূলুল্লাহ্ (সা) খণ্ড-বিখণ্ড করে দিয়েছিলেন। তারা মুসলমানদের মহান ঐক্য শক্তিকে দেশ, ভাষা, বর্ণ, বংশ ও পরিবারের বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত করে তাদেরকে পরস্পরে সংঘর্ষে লিপ্ত করে দিল। এভাবে শত্রুদের হীন মনোবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য ময়দান পরিষ্কার হয়ে গেল। আজ এরই অশুভ পরিণতি চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যে মুসলমান একদা এক জাতি ও এক প্রাণ ছিল, তারা এখন ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে। অপরপক্ষে শয়তানী শক্তিগুলো পারস্পরিক মতবিরোধ সত্ত্বেও মুসলমানদের মুকাবিলায় এক জাতিই প্রতীয়মান হয়।

وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ —তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর তোমাদের আকৃতিকে সুশ্রী করেছেন। আকৃতি তৈরী করা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বস্রষ্টার বিশেষ গুণ। এজন্যই আল্লাহ্র নামসমূহের মধ্যে مصور অর্থাৎ আকৃতিদাতা বর্ণিত আছে। চিন্তা করুন, সৃষ্ট জগতে কত বিভিন্ন জাতি রয়েছে, প্রত্যেক জাতিতে কত বিভিন্ন শ্রেণী রয়েছে এবং প্রত্যেক শ্রেণীতে লাখো বিভিন্ন ব্যক্তি রয়েছে। তাদের একজনের আকৃতি অপরজনের আকৃতির সাথে খাপ খায় না। একই মানব শ্রেণীর মধ্যে দেশ ও ভূখণ্ডের বিভিন্নতার কারণে এবং বংশ ও জাতির বিভিন্নতার কারণে আকৃতিতে সুস্পষ্ট পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। তদুপরি তাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির মুখাবয়ব অন্য সবার থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। এই বিস্ময়কর কারিগরি ও ভাস্কর্য দেখে জ্ঞানবুদ্ধি দিশেহারা হয়ে পড়ে। মানুষের চেহারা ছয়-সাত বর্গইঞ্চির অধিক নয়। কোটি কোটি মানুষের একই ধরনের চেহারা সত্ত্বেও একজনের আকার অন্যজনের সাথে পুরোপুরি মিলে না যে, চেনা কঠিন হয়। আলোচ্য আয়াতে আকার নির্মাণের নিয়ামত উল্লেখ করার পর বলা হয়েছেঃ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ অর্থাৎ তিনি মানবাকৃতিকে সমগ্র সৃষ্ট জগত ও সৃষ্ট জীবে আকৃতি অপেক্ষা অধিক সুন্দর

ও সুষম করেছেন। কোন মানুষ তার দলের মধ্যে যতই কুৎসিত ও কদাকার হোক না কেন, অবশিষ্ট সকল জীবজন্তুর আকৃতির তুলনায় সে-ও সুশ্রী।

بشر—فَقَالُوْا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا-শব্দটি একবচন হলেও বহুবচনের অর্থ দেয়। তাই يَهْدُوْنَ বহুবচন ক্রিয়াপদ তার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। মানবত্বকে নবুয়ত ও রিসালতের পরিপন্থী মনে করাও কাফিরদের একটি অলীক ধারণা ছিল। কোরআনে স্থানে স্থানে এই ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে। পরিতাপের বিষয়, এখন মুসলমানদের মধ্যেও কেউ কেউ এমন দেখা যায়, যারা নবী করীম (সা)-এর মানবত্ব অস্বীকার করে। তাদের চিন্তা করা উচিত যে, তারা কোন্ পথে অগ্রসর হচ্ছে? মানব হওয়া নবুয়তেরও পরিপন্থী নয় এবং রিসালতের উচ্চমর্যাদারও প্রতিকূলে নয়। রসূল (সা) নূর হলেও মানব হতে পারেন। তিনি নূরও এবং মানবও। তাঁর নূরকে প্রদীপ, সূর্য ও চন্দ্রের নূরের নিরিখে বিচার করা ভুল।

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا—(বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর রসূলের প্রতি এবং সেই নূরের প্রতি, যা আমি নাযিল করেছি)। এখানে নূর বলে কোরআন বোঝানো হয়েছে। কারণ, নূরের স্বরূপ এই যে, সে নিজেও দেদীপ্যমান ও উজ্জ্বল এবং অপরকেও দেদীপ্যমান ও উজ্জ্বল করে। কোরআন স্বকীয় অলৌকিকতার কারণে নিজে যে উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির কারণাদি, বিধি-বিধান, শরীয়ত এবং পরজগতের সঠিক তথ্যাবলী উজ্জ্বল হয়ে উঠে। এগুলো জানা মানুষের জন্য জরুরী।

কিয়ামতকে লোকসানের দিন বলার কারণ ঃ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ

ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ—যেদিন আল্লাহ্ তোমাদেরকে একত্র করবেন একত্র করার দিবসে। এই দিনটি হবে লোকসানের। يَوْمَ الْجَمْعِ একত্রিত হওয়ার দিবস ও يَوْمُ التَّغَابُنِ লোকসানের দিবস—এই উভয়টি কিয়ামতের নাম। একত্রিত হওয়ার দিন এ কারণে যে, সেদিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল জিন এবং মানবকে হিসাব-নিকাশের জন্য একত্র করা হবে। পক্ষান্তরে تغابن শব্দটি غبن থেকে ব্যুৎপন্ন। এর অর্থ লোকসান। আর্থিক লোকসান এবং মত ও বুদ্ধির লোকসান উভয়কে غبن বলা হয়। ইমাম রাগিব ইস্পাহানী মুফরাদাতুল কোরআনে বলেন ঃ আর্থিক লোকসান জ্ঞাপন করার জন্য এই

শব্দটি صيغة مجهول এ ব্যবহৃত হয় এবং মত ও বুদ্ধির লোকসান জ্ঞাপন করার জন্য باب سمع থেকে ব্যবহৃত হয়। تغابن শব্দটি আভিধানিক দিক দিয়ে দুই তরফা কাজের জন্য বলা হয় অর্থাৎ একজন অন্যজনের এবং অন্যজন তার লোকসান করবে অথবা তার লোকসান প্রকাশ করবে। কিন্তু আয়াতে একতরফা লোকসান প্রকাশ করা উদ্দেশ্য। এই শব্দের এই ব্যবহারও খ্যাত ও সুবিদিত। কিয়ামতকে লোকসানের দিবস বলার কারণ এই যে, সহীহ হাদীসে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের জন্য পরকালে দুইটি গৃহ নির্মাণ করেছেন---একটি জাহান্নামে অপরটি জান্নাতে। জান্নাতীদেরকে জান্নাতে দাখিল করার পূর্বে সেই গৃহও দেখানো হবে, যা ঈমান ও সৎকর্মের অবর্তমানে তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল, যাতে সেই গৃহ দেখার পর জান্নাতের গৃহের যথার্থ কদর তাদের অন্তরে সৃষ্টি হয় এবং তারা আল্লাহ্ তা'আলার অধিক কৃতজ্ঞ হয়। এমনিভাবে জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে দাখিল করার পূর্বে সেই গৃহও দেখানো হবে যা ঈমান ও সৎকর্ম বর্তমান থাকলে তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল যাতে তাদের পরিতাপ আরও বাড়ে। জাহান্নামে জান্নাতীদের যেসব গৃহ ছিল, সেগুলোও জাহান্নামীদের ভাগে পড়বে। পক্ষান্তরে কাফির, পাপাচারী ও হতভাগাদের যেসব গৃহ জান্নাতে ছিল, সেগুলোও জান্নাতীদের অধিকারে চলে যাবে। তখন জাহান্নামীরা তাদের লাভ-লোকসান সত্যি সত্যি অনুভব করতে সক্ষম হবে যে, তারা কি ছাড়ল এবং কি পেল। এসব রেওয়ায়েত বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে বিভিন্ন ভাষায় বর্ণিত আছে।

মুসলিম, তিরমিযী ইত্যাদি গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে রসূলুল্লাহ্ (সা) একবার সাহাবায়ে কিরামকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমরা জান, নিঃস্ব কে? সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন ঃ যার কাছে ধন-সম্পদ নেই, আমরা তাকে নিঃস্ব মনে করি। তিনি বললেন ঃ আমার উম্মতের মধ্যে সেই ব্যক্তি নিঃস্ব, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদির পুঁজি নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু সে দুনিয়াতে কাউকে গালি দিয়েছিল, কারও প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছিল, কাউকে প্রহার কিংবা হত্যা করেছিল এবং কারও ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করেছিল, হাশরের মাঠে তারা সবাই উপস্থিত হয়ে নিজ নিজ দাবী পেশ করবে। কেউ তার নামায নিয়ে যাবে, কেউ রোযা, কেউ যাকাত এবং কেউ অন্যান্য সৎকর্ম নিয়ে যাবে। যখন তার সৎকর্ম নিঃশেষ হয়ে যাবে, তখন তার হাতে উৎপীড়িত লোকদের গোনাহ্ তার উপর চাপিয়ে দিয়ে প্রাপ্য চুকানো হবে। এর পরিণতিতে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

বুখারীর এক রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তির কাছে কারও কোন পাওনা থাকে, তার উচিত দুনিয়াতেই তা পরিশোধ করে অথবা মাফ করিয়ে নিয়ে মুক্ত হয়ে যাওয়া। নতুবা কিয়ামতের দিন দিরহাম ও দীনার থ কবে না। কারও কোন দাবী থাকলে তা সে ব্যক্তির সৎকর্ম দিয়ে পরিশোধ করা হবে। সৎকর্ম শেষ হয়ে গেলে পাওনাদারের গোনাহ্ প্রাপ্য পরিমাণে তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।---(মাযহারী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও অন্যান্য তফসীরবিদ কিয়ামতকে লোকসানের দিবস বলার উপরোক্ত কারণই বর্ণনা করেছেন। আবার অনেকের মতে সেদিন কেবল কাফির,

পাপাচারী ও হতভাগাই লোকসান অনুভব করবে না ; বরং সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনগণও এভাবে লোকসান অনুভব করবে যে, হায়! আমরা যদি আরও বেশী সৎকর্ম করতাম, তবে জান্নাতের সুউচ্চ মর্তবা লাভ করতাম। সেদিন প্রত্যেকেই জীবনের সেই সময়ের জন্য পরিতাপ করবে, যা অন্যথা ব্যয় করেছে। হাদীসে আছে ঃ من جلس مجلسا لم يذكر الله فيه كان عليه حسرة يوم القيامة ---যে ব্যক্তি কোন মজলিসে বসে এবং সমগ্র মজলিসে আল্লাহ্‌কে স্মরণ না করে, কিয়ামতের দিন সেই মজলিস তার জন্য পরিতাপের কারণ হবে।

কুরতুবীতে আছে প্রত্যেক মু'মিনও সেদিন সৎকর্ম ত্রুটির কারণে স্বীয় লোকসান অনুভব করবে। সূরা মরিয়মে কিয়ামতের নাম يوم الحسرة পরিতাপ দিবস বলে বর্ণিত হয়েছে। তারই অনুরূপ এখানে লোকসান দিবস নাম রাখা হয়েছে।

সূরা মরিয়মে বলা হয়েছে ঃ ---وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ

রূহুল মা'আনীতে এই আয়াতের তফসীরে বলা হয়েছে, সেদিন জালিম ও দুষ্কর্মীরা তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য পরিতাপ করবে এবং কর্মকে অধিকতর সুন্দর করতে সচেষ্ট হয়নি—এমন সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনগণও পরিতাপ করবে। এভাবে কিয়ামতের দিন সবাই নিজ নিজ ত্রুটির কারণে অনুতপ্ত হবে এবং কম আমল করার কারণে লোকসান অনুভব করবে। তাই একে লোকসান দিবস বলা হয়েছে।

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِنۢ بِاللَّهِ يَهْدِ
قَلْبَهُۥ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۖ
فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَٰغُ الْمُبِينُ ﴿١٢﴾ اللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا
هُوَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٣﴾ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا
إِنَّ مِنْ أَزْوَٰجِكُمْ وَأَوْلَٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن تَعْفُوا
وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾ إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَ
أَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا
اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَن

يُوقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ
قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ۝
عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

(১১) আল্লাহ্‌র নির্দেশ ব্যতিরেকে কোন বিপদ আসে না এবং যে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সৎ পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ্‌ সর্ব বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। (১২) তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমার রসূলের দায়িত্ব কেবল খোলাখুলি পৌঁছিয়ে দেওয়া। (১৩) আল্লাহ্‌, তিনি ব্যতীত কোন মাবূদ নেই। অতএব মু'মিনগণ আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করুক। (১৪) হে মু'মিনগণ, তোমাদের কোন কোন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের দুশমন। অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক। যদি মার্জনা কর, উপেক্ষা কর এবং ক্ষমা কর, তবে আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (১৫) তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষা-স্বরূপ। আর আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার। (১৬) অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহ্‌কে ভয় কর, শুন, আনুগত্য কর এবং ব্যয় কর। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম। (১৭) যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দান কর, তিনি তোমাদের জন্য তা দ্বিগুণ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্‌ গুণগ্রাহী, সহনশীল। (১৮) তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(কুফর যেমন পরকালীন সাফল্যের পথে পুরাপুরি বাধা, তেমনি ধনসম্পদ, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী ইত্যাদিতে মশগুল হয়ে আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে ত্রুটি করাও এক পর্যায়ে পরকালীন সাফল্যের পথে বাধা। তাই বিপদাপদে এরূপ মনে করা উচিত যে ;) কোন বিপদ আল্লাহ্‌র আদেশ ব্যতিরেকে আসে না। (এরূপ মনে করে সবর ও সন্তুষ্টি অবলম্বন করা উচিত)। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি (পূর্ণ) বিশ্বাস রাখে, তিনি তার অন্তরকে (সবর ও সন্তুষ্টির) পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ্‌ সর্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। (কে সবর ও সন্তুষ্টি অবলম্বন করল, কে করল না, তিনি সব জানেন এবং প্রত্যেককে তদনুযায়ী প্রতিদান ও শাস্তি দেন। সার কথা এই যে, বিপদাপদসহ প্রত্যেক ব্যাপারে) আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রসূল (সা)-এর আনুগত্য কর। যদি তোমরা (আনুগত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে (মনে রেখ,) আমার রসূল (সা)-এর দায়িত্ব কেবল খোলাখুলি পৌঁছিয়ে দেওয়া। (এই দায়িত্ব তিনি সুন্দরভাবে পালন করেছেন। তাই তাঁর কোন ক্ষতি হবে না---ক্ষতি তোমাদেরই হবে। আল্লাহ্‌র ক্ষতি হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই, তাই এখানে তা বর্ণনা করা হয়নি। তোমাদের এবং বিশেষভাবে বিপদগ্রস্তদের এরূপ মনে করা উচিত যে,) তোমাদের কোন কোন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের (ধর্মের)

দুশমন (যদি তারা নিজেদের ইহলৌকিক উপকারের জন্য এমন বিষয়ের আদেশ করে, যাতে তোমাদের পারলৌকিক অনিষ্ট আছে।) অতএব তোমরা তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাক (এবং তাদের উক্তরূপ আদেশ পালনে বিরত থাক।) যদি (তোমরা এরূপ ফরমায়েশের কারণে রাগ করে তাদের প্রতি কঠোরতা কর এবং তারা ক্ষমা চেয়ে তওবা করে নেয়, তবে এরপর যদি) তোমরা (তাদের তখনকার ত্রুটি) মার্জনা কর (অর্থাৎ শাস্তি না দাও), উপেক্ষা কর (অর্থাৎ বেশী তিরস্কার না কর) এবং ক্ষমা কর (অর্থাৎ তা মনে ও মুখে ভুলে যাও) তবে আল্লাহ্ তা'আলা (তোমাদের গোনাহের জন্য) ক্ষমাশীল, (তোমাদের অবস্থার প্রতি) করুণাময়। (এতে ক্ষমা করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। শাস্তি দিলে নির্ভীক হয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকলে ক্ষমা করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কোন কোন সময় ক্ষমা করা মোস্তাহাব। অতঃপর ধনসম্পদ সম্পর্কে সন্তান-সন্ততির ন্যায় বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কেবল পরীক্ষাস্বরূপ। (উদ্দেশ্য এটা দেখা যে, কে এতে মশগুল হয়ে আল্লাহ্কে ভুলে যায় এবং কে স্মরণ রাখে। যে এতে মশগুল হয়ে আল্লাহ্কে স্মরণ রাখে, তার জন্য) আল্লাহ্র কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার। অতএব (এসব কথা শুনে) তোমরা যথা-সাধ্য আল্লাহ্কে ভয় কর, (তার আদেশ-নিষেধ) শুন, আনুগত্য কর এবং (বিশেষভাবে যেখানে ব্যয় করতে বলা হয়েছে, সেখানে) ব্যয় কর। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। (সম্ভবত এটা সুকঠিন বলে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে।) যারা মনের লালসা থেকে মুক্ত, তারাই (পরকালে) সফলকাম। (অতঃপর এই সফলতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে,) যদি তোমরা আল্লাহ্কে উত্তম (আন্তরিকতাপূর্ণ) ঋণ দান কর, তবে তিনি তোমাদের জন্য তা দ্বিগুণ করে দেবেন এবং তোমাদের গোনাহ্ মাফ করবেন। আল্লাহ্ গুণগ্রাহী (সৎকর্ম গ্রহণ করেন এবং) সহনশীল (গোনাহ্ করলে তাৎক্ষণিক শাস্তি দেন না)। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, পরা-ক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। (شكور থেকে حكيم পর্যন্ত বিষয়বস্তু সূরার বিষয়বস্তুর কারণ স্বরূপ)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ

অর্থাৎ আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতিরেকে কারও উপর কোন বিপদ আসে না এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস রাখে, আল্লাহ্ তার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন। এটা অনস্বীকার্য সত্য যে, আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি ও ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোথাও সামান্যতম বস্তুও নড়াচড়া করতে পারে না। আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া কেউ কারও কোন ক্ষতি এবং উপকার করতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তকদীরে বিশ্বাসী নয়, বিপদ মুহূর্তে তার জন্য কোন স্থিরতা ও শান্তির উপকরণ থাকে না। সে বিপদ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে হাহুতাশ ও ছটফট করতে থাকে। এর বিপরীতে তকদীরে বিশ্বাসী মু'মিনের অন্তরকে আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়ে স্থির বিশ্বাসী করে দেন যে, যা কিছু হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি ও ইচ্ছাক্রমে হয়েছে। যে বিপদ তাকে স্পর্শ করেছে, তা অবধারিত ছিল, কেউ একে টলাতে পারত না এবং যে বিপদ থেকে সে মুক্ত রয়েছে, তা থেকে মুক্ত থাকাই অবধারিত ছিল। তাকে এই বিপদে জড়িত থাকার

সাধ্য কারও ছিল না। এই ঈমান ও বিশ্বাসের ফলে পরকালের সওয়াবের ওয়াদাও তার সামনে থাকে, যদ্দ্বারা দুনিয়ার বৃহত্তম বিপদও সহজ হয়ে যায়।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ

---অর্থাৎ মুসলমানগণ, তোমাদের কতক স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের শত্রু। তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা কর। তিরমিযী, হাকেম প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, এই আয়াত সেই মুসলমানদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা হিজরতের পর মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে হিজরত করে চলে যেতে মনস্থ করে, কিন্তু তাদের পরিবার-পরিজনরা তাদেরকে হিজরত করতে বাধা দেয়।
--- (রূহুল-মা'আনী)

এটা তখনকার কথা, যখন মক্কা থেকে হিজরত করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয ছিল। আলোচ্য আয়াতে এরূপ স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে মানুষের শত্রু আখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করার জোর আদেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা, তার চাইতে বড় শত্রু মানুষের কেউ হতে পারে না, যে তাকে চিরকালীন আযাব ও জাহান্নামের অগ্নিতে লিপ্ত করে দেয়।

হযরত আতা ইবনে আবূ রাবাহ (রা) বর্ণনা করেন, এই আয়াত আওফ ইবনে মালেক আশজায়ী (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি মদীনায় ছিলেন এবং যখনই কোন যুদ্ধ ও জিহাদের সুযোগ আসত, তিনি তাতে যোগদান করার ইচ্ছা করতেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ও সন্তানরা এই বলে ফরিয়াদ শুরু করে দিত ঃ আমাদেরকে কার কাছে ছেড়ে যাবে। তিনি তাদের ফরিয়াদে প্রভাবান্বিত হয়ে সংকল্প ত্যাগ করতেন।---(ইবনে কাসীর)

উপরোক্ত উভয় রেওয়ায়েতের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। উভয় ঘটনা আয়াত অবতরণের কারণ হতে পারে। কেননা, হিজরত হোক কিংবা জিহাদ, যে স্ত্রী ও সন্তান আল্লাহ্র ফরয পালনে বাধ সাধে, তারা শত্রু।

وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ—পূর্ববর্তী আয়াতে যাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে শত্রু আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে ভবিষ্যতে স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে কঠোর ব্যবহার করার ইচ্ছা করল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতের এই অংশে বলা হয়েছে ঃ যদিও এই স্ত্রী ও সন্তানরা তোমাদের জন্য শত্রুর ন্যায় কাজ করেছে এবং তোমাদেরকে ফরয পালনে বাধা দিয়েছে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের সাথে কঠোর ও নির্দয় ব্যবহার করো না; বরং মার্জনা, উপেক্ষা ও ক্ষমার ব্যবহার কর। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার অভ্যাসও ক্ষমা এবং দয়া প্রদর্শন করা।

গোনাহ্গার স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে সম্পর্কছেদ করা ও বিদ্বেষ রাখা অনুচিত ঃ আলিমগণ আলোচ্য আয়াতদৃষ্টে বলেছেন যে, পরিবার-পরিজনের কেউ কোন শরীয়ত বিরোধী কাজ করে ফেললেও তার সাথে সম্পর্কছেদ করা, তার প্রতি বিদ্বেষ রাখা ও তার জন্য বদদোয়া করা উচিত নয়।---(রূহুল-মা'আনী)

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ—فتنة শব্দের অর্থ পরীক্ষা। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের পরীক্ষা নেন যে, এ সবের মহব্বতে লিপ্ত হয়ে সে আল্লাহ্র বিধানাবলীকে উপেক্ষা করে না, মহব্বতকে যথাসীমায় রেখে স্বীয় কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হয়।

ধনসম্পদ সন্তান-সন্ততি মানুষের জন্য বিরাট পরীক্ষা ঃ সত্য বলতে কি ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মহব্বত মানুষের জন্য একটি অগ্নিপরীক্ষা। মানুষ অধিকাংশ সময় তাদের মহব্বতের কারণেই গোনাহে---বিশেষত অবৈধ--উপার্জনে লিপ্ত হয়। হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন এমন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে, যাকে দেখে অন্যেরা বলবে ঃ اكل عيالك حسناتك অর্থাৎ তার পুণ্যগুলোকে তার পরিজনেরা খেয়ে ফেলেছে। —(রূহুল-মা'আনী) এক হাদীসে রসূলে করীম (সা) সন্তানদের সম্পর্কে বলেন ঃ مبخلة مجبنة অর্থাৎ সন্তান-সন্ততি হচ্ছে মানুষের কৃপণতা ও কাপুরুষতার কারণ। তাদের মহব্বতের কারণে মানুষ আল্লাহ্র পথে টাকা-পয়সা ব্যয় করা থেকে বিরত থাকে এবং তাদেরই মহব্বতের কারণে জিহাদে যোগদান করা থেকে গা বাঁচিয়ে চলে। জনৈক পূর্ববর্তী বুযুর্গ বলেন ঃ العيال سوس الطاعات অর্থাৎ পরিবার-পরিজন মানুষের পুণ্য-সমূহের জন্য ঘুণ বিশেষ। ঘুণ যেমন শস্যকে খেয়ে ফেলে, তেমনি পরিবার-পরিজনও মানুষের পুণ্যসমূহকে খেয়ে নিঃশেষ করে দেয়।

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ—অর্থাৎ যথাসাধ্য তাকওয়া ও আল্লাহ্ভীতি অবলম্বন কর। এর আগে কোরআন পাকে এই আয়াত নাযিল হয়েছিল ঃ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্কে এমন ভয় কর, যেমন ভয় করা তাঁর প্রাপ্য। এই আয়াত সাহাবায়ে কেরামের কাছে খুবই দুঃসাধ্য ও কঠিন মনে হয়। কারণ, আল্লাহ্র প্রাপ্য অনুযায়ী আল্লাহ্কে ভয় করার সাধ্য কার আছে? এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে ব্যক্ত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে তার শক্তি ও সাধ্যের বাইরে কোন কিছু করার আদেশ করেন না। কাজেই তাকওয়া ও সাধ্যানুযায়ী ওয়াজিব বুঝতে হবে। উদ্দেশ্য এই যে, তাকওয়া অর্জনে কেউ তার পূর্ণ শক্তি ও চেষ্টা নিয়োজিত করলেই আল্লাহ্র প্রাপ্য আদায় হয়ে যাবে।---(রূহুল-মা'আনী---সংক্ষেপিত)

سورة الطلاق

সূরা তালাক

মদীনায় অবতীর্ণ, ১২ আয়াত, ২ রুকূ'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا
الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا
يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُوْدُ
اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ۚ لَا تَدْرِيْ
لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ۝١ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ
فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّاَشْهِدُوْا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ۚ ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ
مَخْرَجًا ۝٢ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ
فَهُوَ حَسْبُهٗ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ۚ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ
قَدْرًا ۝٣ وَالّٰٓـِٔيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ ۙ وَّالّٰٓـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ
اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ
اَمْرِهٖ يُسْرًا ۝٤ ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗٓ اِلَيْكُمْ ۚ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ

يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗٓ اَجْرًا ۝ اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ
سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ ۭ وَاِنْ كُنَّ
اُولَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۚ وَاْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ ۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ
فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰى ۝ لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ۭ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ
رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ۭ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَا ۭ
سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) হে নবী! তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে চাও, তখন তাদেরকে তালাক দিয়ো ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং ইদ্দত গণনা করো। তোমরা তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্‌কে ভয় করো। তাদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করো না এবং তারাও যেন বের না হয় যদি না তারা কোন সুস্পষ্ট নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত হয়। এগুলো আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সীমালংঘন করে, সে নিজেরই অনিষ্ট করে। সে জানে না, হয়তো আল্লাহ্‌ এই তালাকের পর কোন নতুন উপায় করে দেবেন। (২) অতঃপর তারা যখন তাদের ইদ্দতকালে পৌঁছে তখন তাদেরকে যথোপযুক্ত পন্থায় রেখে দেবে অথবা যথোপযুক্ত পন্থায় ছেড়ে দেবে এবং তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য লোককে সাক্ষী রাখবে। তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দেবে। এতদ্বারা যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। আর যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্‌ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ করে দেবেন। (৩) এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ্‌ স্বীয় কাজ পূর্ণ করবেনই। আল্লাহ্‌ সবকিছুর জন্য একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন। (৪) তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের ঋতুবতী হওয়ার আশা নেই, তাদের ব্যাপারে সন্দেহ হলে তাদের ইদ্দত হবে তিন মাস। আর যারা এখনও ঋতুর বয়সে পৌঁছেনি, তাদেরও অনুরূপ ইদ্দতকাল হবে। গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্‌ তার কাজ সহজ করে দেন। (৫) এটা আল্লাহ্‌র নির্দেশ, যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন। যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্‌ তার পাপ মোচন করেন এবং তাকে মহাপুরস্কার দেন। (৬) তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেরূপ গৃহে বাস কর, তাদেরকেও বসবাসের জন্য সেরূপ গৃহ দাও। তাদেরকে কষ্ট দিয়ে সংকটাপন্ন করো না। যদি তারা গর্ভবতী হয়, তবে

সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের বায়ভার বহন করবে। যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্যদান করে, তবে তাদেরকে তাদের প্রাপ্য পারিশ্রমিক দেবে এবং এ সম্পর্কে পরস্পরে সংযতভাবে পরামর্শ করবে। তোমরা যদি পরস্পরে জিদ কর, তবে অন্য নারী স্তন্যদান করবে। (৭) বিত্তশালী ব্যক্তি তার বিত্ত অনুযায়ী ব্যয় করবে। যে ব্যক্তি সীমিত পরিমাণে রিযিকপ্রাপ্ত, সে আল্লাহ্ যা দিয়েছেন, তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ্ যাকে যা দিয়েছেন, তদপেক্ষা বেশী ব্যয় করার আদেশ কাউকে করেন না। আল্লাহ্ কষ্টের পর সুখ দেবেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে পয়গম্বর (সা)! (আপনি লোকদেরকে বলে দিন ঃ) তোমরা যখন (এমন) স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে চাও, (যাদের সাথে নির্জনবাস হয়েছে। কেননা, এমন স্ত্রীদের সাথেই ইদ্দতের বিধান সম্পৃক্ত; যেমন অন্য এক আয়াতে আছে ঃ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ) তখন তাদেরকে ইদ্দতকালের (অর্থাৎ হায়েযের) পূর্বে (অর্থাৎ পবিত্র থাকা অবস্থায়) তালাক দাও। (সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, এই অবস্থায় তালাকের পূর্বে সহবাসও না হওয়া চাই)। এবং (তালাক দেওয়ার পর তোমরা) ইদ্দতের হিসাব রাখ। (অর্থাৎ পুরুষ ও নারী সবাই হিসাব রাখবে। তবে নারীরা সাধারণত ভুলে যায় বিধায় বিশেষভাবে পুরুষদেরকে হিসাব রাখতে বলা হয়েছে)। তোমরা তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্কে ভয় কর। (অর্থাৎ এসব অধ্যায়ে তাঁর যেসব বিধান রয়েছে, সেগুলো লংঘন করো না; উদাহরণত এক দফায় তিন তালাক দিয়ো না, হায়েয অবস্থায় তালাক দিয়ো না এবং ইদ্দতকালে স্ত্রীদেরকে) তাদের (বসবাসের) গৃহ থেকে বহিষ্কার করো না। (কারণ, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরও বিবাহিতা স্ত্রীর ন্যায় বসবাসের অধিকার রয়েছে)। এবং তারাও যেন নিজেরা বের না হয় (কারণ, বসবাসের অধিকার কেবল স্বামী প্রদত্ত হক নয় যে, সে ইচ্ছা করলে তা রহিত হয়ে যাবে; বরং এটা শরীয়ত প্রদত্ত হক)। যদি না তারা কোন সুস্পষ্ট নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত হয়। (লিপ্ত হলে তা ভিন্ন কথা। উদাহরণত তারা ব্যভিচার অথবা চৌর্য কর্মে লিপ্ত হলে শাস্তিস্বরূপ বহিষ্কার করা হবে। কোন কোন আলিম বলেন ঃ কটুভাষিণী হলে এবং সার্বক্ষণিক কলহে লিপ্ত হলেও তাদেরকে বহিষ্কার করা জায়েয)। এগুলো আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধান। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বিধান লংঘন করে, (উদাহরণত স্ত্রীকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করে দেয়) সে নিজেরই ক্ষতি করে অর্থাৎ গোনাহ্গার হয়। অতঃপর তালাকদাতাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে যে, বিভিন্ন তালাকের মধ্যে প্রত্যাহারযোগ্য তালাক দেওয়াই উত্তম। ইরশাদ হয়েছে ঃ হে তালাকদাতা) তুমি জান না, হয়তো আল্লাহ্ এই তালাকের পর কোন নতুন উপায় (তোমাদের অন্তরে সৃষ্টি) করে দেবেন (যেমন তালাকের জন্য অনুতপ্ত হবে। তখন প্রত্যাহারযোগ্য তালাক হলে ক্ষতিপূরণ সহজ হবে)। অতঃপর তারা (অর্থাৎ প্রত্যাহারযোগ্য তালাকপ্রাপ্তা

স্ত্রীরা) যখন তাদের ইদ্দতকালে পৌঁছে (এবং ইদ্দত শেষ না হয়), তখন (তোমাদের দু'রকম ক্ষমতা আছে, হয়) তাদেরকে যথোপযুক্ত পন্থায় (প্রত্যাহার করত) বিবাহে রেখে দেবে অথবা যথোপযুক্ত পন্থায় ছেড়ে দেবে (অর্থাৎ ইদ্দতের শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহার করবে না। উদ্দেশ্য এই যে, তৃতীয় পথ অবলম্বন করবে না যে, রাখাও উদ্দেশ্য নয় কিন্তু ইদ্দত দীর্ঘায়িত করার মাধ্যমে স্ত্রীর ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে প্রত্যাহার করে নেবে)। এবং (যাই কর, রাখ অথবা ছাড়, তার জন্য) তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য লোককে সাক্ষী রাখবে। [এটা মোস্তাহাব (হিদায়া, নিহায়া) প্রত্যাহারের বেলায় এজন্য সাক্ষী রাখতে হবে, যাতে ইদ্দত শেষ হওয়ার পর স্ত্রী ভিন্নমত ব্যক্ত না করে এবং ছেড়ে দেওয়ার বেলায় এজন্য, যাতে নিজের মনই দুষ্টুমিতে প্রবৃত্ত না হয় এবং প্রত্যাহার করেছিল বলে মিথ্যা দাবী না করে বসে। হে সাক্ষিগণ, যদি সাক্ষ্য দানের প্রয়োজন হয়, তবে] তোমরা ঠিক ঠিক আল্লাহ্‌র উদ্দেশে (কোনরূপ খাতির না করে) সাক্ষ্য দেবে। এতদ্বারা যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। (উদ্দশ্য এই যে, বিশ্বাসী ব্যক্তিই উপদেশ দ্বারা লাভবান হয়। নতুন উপদেশ সবার জন্য ব্যাপক। এখন উপরে নির্দেশিত তাকওয়ার কয়েকটি ফযীলত বর্ণনা করা হচ্ছে। প্রথম এই যে) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য (ক্ষয়ক্ষতি থেকে) নিষ্কৃতির পথ করে দেন এবং (অনেক উপকার দান করেন। তন্মধ্যে একটি বড় উপকার হচ্ছে রিযিক। অতএব) তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিক পৌঁছান, যা তার ধারণাও থাকে না। (তাকওয়ার অপর শাখা হচ্ছে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা। এর বৈশিষ্ট্য এই যে) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে, তার (কার্যোদ্ধারের) জন্য তিনিই যথেষ্ট। (অর্থাৎ তিনি নিজে যথেষ্ট হওয়ার প্রতিক্রিয়া কার্যোদ্ধারের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রকাশ করেন। নতুবা তিনি সারা বিশ্বের জন্য যথেষ্ট। এই কার্যোদ্ধারও ব্যাপক---অনুভূত হোক কিংবা অননুভূত হোক। কেননা) আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কাজ (যেভাবে চান) পূর্ণ করে ছাড়েন। (এমনিভাবে কার্যোদ্ধারের সময়ও তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। কেননা) আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছুর জন্য একটা পরিমাণ (স্বীয় জ্ঞানে) স্থির করে রেখেছেন। (তদনুযায়ী তা বাস্তবায়িত করাই প্রজ্ঞাভিত্তিক হয়ে থাকে। অতঃপর আবার বিধানাবলী বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ উপরে ইদ্দত সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছিল। এখন বিস্তারিত বিবরণ এই যে) তোমাদের (তালাকপ্রাপ্তা) স্ত্রীদের মধ্যে যারা (বেশী বয়স হওয়ার কারণে) ঋতুবতী হওয়া থেকে নিরাশ হয়ে গেছে, তাদের (ইদ্দত কি হবে, সে) ব্যাপারে তোমাদের সন্দেহ হলে (যেমন বাস্তবে সন্দেহ হয়েছিল এবং প্রশ্ন উঠেছিল) তাদের ইদ্দত হবে তিন মাস। আর যারা এখনও হায়েযের বয়সে পৌঁছেনি, তাদেরও অনুরূপ (তিন মাস) ইদ্দত হবে। গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত (সন্তান পূর্ণাঙ্গ প্রসব হোক কিংবা অপূর্ণাঙ্গ। যদি কোন অঙ্গ এমনকি, একটি অঙ্গুলিও গঠিত হয়ে থাকে। তাকওয়া নিজেও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এছাড়া উল্লিখিত পার্থিব ব্যাপারাদি সম্পর্কিত বিধানাবলী সম্পর্কে সাধারণ মানুষ ধারণা করতে পারে যে, পার্থিব ব্যাপারের সাথে ধর্মের কি সম্পর্ক? যেভাবে ইচ্ছা করে নিলেই চলবে। তাই অতঃপর আবার তাকওয়ার বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার প্রত্যেক কাজ সহজ করে দেন। (সেটা ইহকালের কাজ হোক কিংবা পরকালের

বাহ্যিক হোক কিংবা অভ্যন্তরীণ। এরপর তাকীদের জন্য বলা হচ্ছে ঃ) এটা (অর্থাৎ যা বর্ণিত হল) আল্লাহ্‌র নির্দেশ, যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন। যে ব্যক্তি (এসব ব্যাপারে এবং অন্যান্য ব্যাপারেও) আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার পাপ মোচন করেন (যা সর্ববৃহৎ বিপদমুক্তি) এবং তাকে মহাপুরস্কার দেন (যা সর্ববৃহৎ উপকার লাভ। অতঃপর আবার তালাকপ্রাপ্তাদের বিধান বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ অর্থাৎ ইদ্দতে স্ত্রীদের আরও অধিকার আছে। তা এই যে) তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেরূপ গৃহে বাস কর, তাদেরকেও বসবাসের জন্য সেরূপ গৃহ দাও। (অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তাকে ইদ্দতে বাসগৃহ দেওয়াও ওয়াজিব তবে বাইন তালাকে উভয়ের এক গৃহে নির্জনবাস জায়েয নয়; বরং উভয়ের মধ্যে অন্তরাল থাকা জরুরী)। তাদেরকে কষ্ট দিয়ে (বাসগৃহের ব্যাপারে) সংকটাপন্ন করো না (উদাহরণত এমন কিছু করো না, যাতে সে উত্ত্যক্ত হয়ে বের হয়ে যায়)। যদি তালাকপ্রাপ্তারা গর্ভবতী হয়, তবে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের (পানাহারের) ব্যয়ভার বহন করবে। (গর্ভবতী নয় ---এমন স্ত্রীদের বিধান এরূপ নয়। তাদের ভরণ-পোষণের মেয়াদ তিন হায়েয অথবা তিন মাস। এসব বিধান ইদ্দত সম্পর্কে বর্ণিত হল। ইদ্দতের পর) যদি তারা (পূর্ব থেকে সন্তানওয়ালী হোক কিংবা সন্তান প্রসবের পর ইদ্দত শেষ হোক) তোমাদের সন্তানদেরকে (পারিশ্রমিকের বিনিময়ে) স্তন্যদান করে তবে তাদেরকে (নির্ধারিত) পারিশ্রমিক দেবে এবং (পারিশ্রমিক সম্পর্কে) পরস্পরে সংযতভাবে পরামর্শ করবে। (অর্থাৎ স্ত্রী বেশী দাবী করবে না যে, স্বামী অন্য ধাত্রী খোঁজ করতে বাধ্য হয় এবং স্বামীও এত কম পারিশ্রমিক দিতে চাইবে না, যাতে স্ত্রীর কাজ না চলে। বরং উভয়ই যথাসম্ভব চেষ্টা করবে, যাতে মাতাই সন্তানকে স্তন্যদান করে। এটা সন্তানের জন্য বেশী উপকারী) তোমরা যদি পরস্পরে জিদ কর, তবে অন্য নারী স্তন্যদান করবে। (অর্থাৎ তখন অন্য নারী খুঁজে নাও---মাতাকে বাধ্য করো না এবং পিতাকেও না। এই খবরসূচক বাক্যে পুরুষকে অল্প পারিশ্রমিক দিতে চাওয়ার কারণে শাসানো হয়েছে যে, কোন-না-কোন নারী তো স্তন্যদান করবে এবং সে-ও সম্ভবত কম পারিশ্রমিক নেবে না। এমতাবস্থায় মাতাকেই কম দিতে চাও কেন? স্ত্রীকেও বেশী পারিশ্রমিক চাওয়ার কারণে শাসানো হয়েছে যে, তুমি স্তন্যদান না করলে অন্য কেউ স্তন্যদান করবে। দুনিয়াতে তুমিই তো একা নও যে, এত বেশী পারিশ্রমিক দাবী কর। অতঃপর সন্তানের ভরণ-পোষণ সম্পর্কে বলা হচ্ছে ঃ) বিত্তশালী ব্যক্তি তার বিত্ত অনুযায়ী (সন্তানের জন্য) ব্যয় করবে। যার আমদানী কম সে আল্লাহ্ যা দিয়েছেন, তা থেকে ব্যয় করবে। (অর্থাৎ গরীব ব্যক্তি গরীবানা মতে ব্যয় করবে। কেননা) আল্লাহ্ যাকে যা দিয়েছেন, তদপেক্ষা বেশী ব্যয় করার আদেশ কাউকে করেন না। (গরীব ব্যক্তি যেন ভয় না করে যে, ব্যয় করলে কিছুই থাকবে না; যেমন কেউ কেউ এই ভয়ে সন্তানকে হত্যা করে দেয়। তাই ইরশাদ হচ্ছে ঃ) আল্লাহ্ তা'আলা কষ্টের পর সুখ দেবেন (যদিও তা প্রয়োজন মাফিকই হয়)। এর অনুরূপ অন্য আয়াতে আছে ঃ وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বিবাহ ও তালাকের শরীয়তসম্মত মর্যাদা ও প্রজ্ঞাভিত্তিক ব্যবস্থা ঃ সূরা বাকারার তফসীরে এই শিরোনামেই এ বিষয়ের পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া উচিত। সংক্ষেপে তা এই যে, বিবাহ ও তালাকের ব্যাপারটি প্রত্যেক ধর্মে বেচাকেনা ও ইজারার ন্যায় সাধারণ লেনদেন নয় যে, উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে যেভাবে ইচ্ছা করে নেবে বরং প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী লোকই স্মরণাতীতকাল থেকে এ বিষয়ে একমত যে, এসব ব্যাপার ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে বিশেষ পবিত্র এবং ধর্মের নির্দেশানুযায়ীই এসব কাজ সম্পন্ন হওয়া উচিত। কিতাবধারী ইহুদী ও খৃস্টান সম্প্রদায় তো একটি ঐশী ধর্ম ও ঐশী কিতাবের সাথে সম্পর্কযুক্তই। তাতে শত শত পরিবর্তন সত্ত্বেও তারা আজও এসব ব্যাপারে কিছু ধর্মীয় বিধি-বিধানের অনুসরণ করে। কাফির ও মুশরিক সম্প্রদায় কোন ঐশী কিতাব ও ঐশী ধর্মের অধিকারী নয় কিন্তু কোন-না-কোন প্রকারে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব স্বীকার করে। যেমন হিন্দু, আর্য, শিখ, অগ্নিপূজারী, নক্ষত্রপূজারী সম্প্রদায়। তারাও বিবাহ ও তালাকের ব্যাপারাদিকে বেচাকেনা ও ইজারার ন্যায় সাধারণ লেনদেন মনে করে না। তারাও এসব ব্যাপারে কিছু ধর্মীয় প্রথা ও আচার-অনুষ্ঠান পালনকে অপরিহার্য জ্ঞান করে। ধর্মের এসব নীতি ও আচার-অনুষ্ঠান অনুযায়ীই সকল ধর্মাবলম্বী পারিবারিক আইন চালু থাকে।

কেবল নাস্তিক ও আল্লাহ্ অস্বীকারকারী এক সম্প্রদায় আছে যারা আল্লাহ্ ও ধর্মের সাথেই সম্পর্কচ্ছেদ করে রয়েছে। তারা এসব ব্যাপারকেও ইজারার অনুরূপ পারস্পরিক সম্মতিক্রমে নিষ্পন্ন করে থাকে। বলা বাহুল্য, এর লক্ষ্য তাদের কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। পরিতাপের বিষয়, আজকাল বিশ্বে এই মতবাদই ব্যাপক প্রসার লাভ করছে, যা মানুষকে জংলী-জানোয়ারদের কাতারে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

ইসলামী শরীয়ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পবিত্র জীবনব্যবস্থার নাম। এতে বিবাহকে কেবল একটি লেনদেন ও চুক্তি নয় বরং এক প্রকার ইবাদতের মর্যাদা দান করা হয়েছে। এই ইবাদতের মধ্যে বিশ্বস্রষ্টার পক্ষ থেকে মানবচরিত্রে গচ্ছিত কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার উত্তম ও পবিত্র উপকরণও রয়েছে এবং নারী ও পুরুষের দাম্পত্য জীবন সম্পর্কিত বংশবৃদ্ধি ও সন্তান পালনের সুষম ও প্রজ্ঞাভিত্তিক ব্যবস্থাও বিদ্যমান আছে।

বৈবাহিক ব্যাপারাদির সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার উপর সাধারণ মানবগোষ্ঠীর সঠিক পথে পরিচালিত হওয়া নির্ভরশীল। তাই কোরআন পাক বৈবাহিক ও পারিবারিক বিষয়াদিকে অন্যসব বিষয় অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দান করেছেন। কোরআন পাঠে গভীর মনোনিবেশকারী ব্যক্তি এটা প্রত্যক্ষ করবে যে, বিশ্বের অর্থনৈতিক বিষয়াদির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্য, শেয়ার-ইজারা ইত্যাদি। কোরআন পাক এসব বিষয়ের কেবল নীতিই ব্যক্ত করেছে। এগুলোর শাখাগত ব্যাপারাদির বর্ণনা কোরআন পাকে খুবই বিরল। কিন্তু কোরআন পাক বিবাহ ও তালাকের শুধু মূলনীতি বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হয়নি। বরং এসবের অধিকাংশ শাখাগত মাস'আলা ও খুঁটিনাটি ব্যাপার আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন পাকে নাযিল করেছেন।

এসব মাস'আলা কোরআনের অধিকাংশ সূরায় বিচ্ছিন্নভাবে এবং সূরা নিসায় অধিক

বিস্তারিত বিবরণসহ বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য 'সূরা তালাকে' বিশেষভাবে তালাক, ইদ্দত ইত্যাদির বিধানাবলী আলোচিত হয়েছে। এ কারণেই কোন কোন হাদীসে একে 'সূরা নিসা সুগরা' অর্থাৎ 'ছোট সূরা নিসা' বলা হয়েছে।---(কুরতুবী)

ইসলামী মূলনীতির গতিধারা এই যে, নারী ও পুরুষের মধ্যে ইসলামী নীতি অনুযায়ী স্থাপিত বৈবাহিক সম্পর্ক অটল ও আজীবন স্থায়ী সম্পর্ক হতে হবে, যাতে উভয়ের ইহকাল ও পরকাল সংশোধিত হয় এবং তাদের মধ্য থেকে জন্মগ্রহণকারী সন্তান-সন্ততির কর্মধারা এবং চরিত্রও সংশোধিত হয়। এ কারণেই বিবাহের ব্যাপারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতি পদক্ষেপে ইসলামের দিকনির্দেশ এই যে, এই সম্পর্ককে সকল প্রকার তিক্ততা ও মন কষাকষি থেকে পবিত্র রাখতে হবে। যদি কোন সময় তিক্ততা হয়ে যায়, তবে তা নিরসনের জন্য পুরো-পুরি চেষ্টা ইসলামে করা হয়েছে। কিন্তু এসব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে এ সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়ার মধ্যেই উভয় পক্ষের জীবনের সাফল্য সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। যেসব ধর্মে তালা-কের বিধান নেই, সেগুলোতে এরূপ পরিস্থিতিতে নানাবিধ সংকটের সম্মুখীন হতে হয় এবং মাঝে মাঝে চরম কুফল সামনে আসে। তাই ইসলাম বিবাহ আইনের সাথে সাথে তালাকের বিধি-বিধানও নির্ধারিত করেছে। কিন্তু সাথে সাথে এ কথাও বলেছে যে, তালাক আল্লাহ্ তা'আলার কাছে খুবই ঘৃণার্হ অপছন্দনীয় কাজ। যথাসম্ভব এ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ হালাল বিষয়সমূহের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সর্বাধিক ঘৃণার্হ বিষয় হচ্ছে তালাক। হযরত আলী (রা)-র বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

تزوجوا و لا تطلقوا فان الطلاق يهتز منه عرش الرحمٰن — অর্থাৎ বিবাহ কর কিন্তু তালাক দিও না। কেননা, তালাকের কারণে আল্লাহ্র আরশ কেঁপে উঠে। হযরত আবূ মূসা (রা)-র রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কোন ব্যভিচার ব্যতিরেকে স্ত্রীদেরকে তালাক দিও না। কারণ, যেসব পুরুষ ও নারী কেবল স্বাদ আস্বাদন করে, আল্লাহ্ তাদেরকে পছন্দ করেন না।---(কুরতুবী) হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) -এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তন্মধ্যে দাসদেরকে মুক্ত করা আল্লাহ্র কাছে প্রিয় এবং পৃথিবীতে সৃষ্ট বিষয়াদির মধ্যে তালাক সর্বাপেক্ষা ঘৃণার্হ ও অপছন্দনীয়।---(কুরতুবী)

সারকথা, ইসলাম যদিও তালাক দিতে উৎসাহিত করেনি বরং যথাসাধ্য বারণ করেছে কিন্তু কোন কোন প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কতিপয় বিধি-বিধানের অধীনে অনুমতি দিয়েছে। এসব বিধি-বিধানের সারমর্ম এই যে, বৈবাহিক সম্পর্ক খতম করাই অপরিহার্য হলে তা সুন্দরভাবে ও যথোপযুক্ত পন্থায় নিষ্পন্ন হতে হবে---একে নিছক মনের ঝাল মিটানো ও প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করার খেলায় পরিণত করা যাবে না। আলোচ্য সূরায় তালাকের বিধান শুরু করে প্রথমে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে 'হে নবী' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। ইমাম কুরতুবী (র)-র বর্ণনা অনুযায়ী যেসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিধান সকল উম্মতের জন্য ব্যাপক হয়ে থাকে, সেসব ক্ষেত্রেই এই সম্বোধন ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে যে ক্ষেত্রে কোন বিধান বিশেষভাবে রসূলের সত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়, সেখানে 'হে রসূল' বলে সম্বোধন করা হয়।